যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুশান্ত বসু

-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩
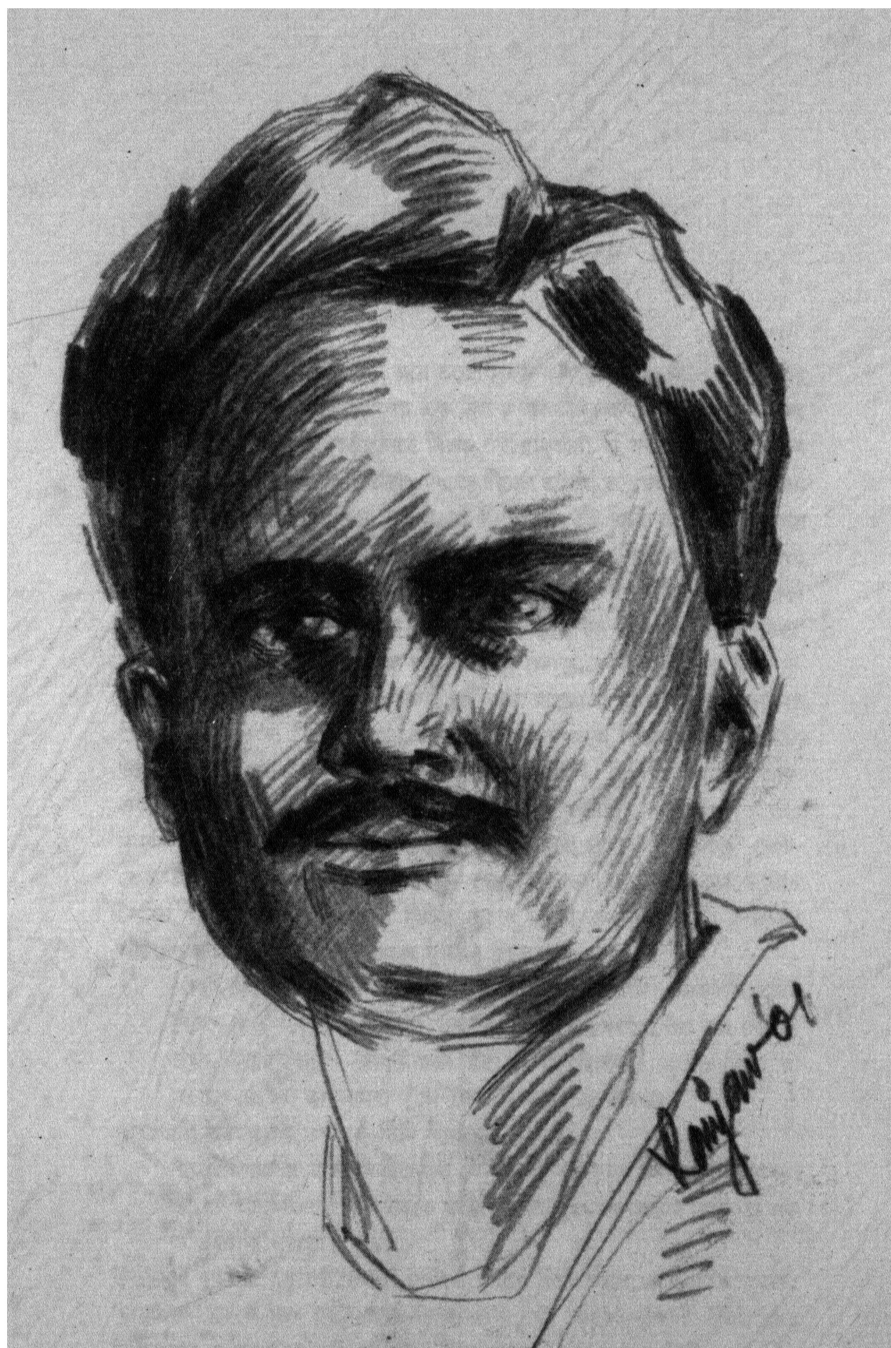
ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ ও অতিক্রম করে প্রত্যেক বড় কবিকেই খুঁজে নিতে হয় নিজের চলার রাস্তা—আপন আত্মপ্রকাশের এক নিজস্ব বাকভঙ্গি। তথাকথিত রবীন্দ্র-যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও কবি যতীন্দ্রনাথ নিছক রবীন্দ্রানুকারী বা রবীন্দ্রানুসারী একজন কবিমাত্র ছিলেন না। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির প্রহরে, তার বহুমাত্রিক বিকিরণের মাঝখানে আপন কাব্যসাধনার ব্রতযাত্রায় নিমগ্নচিত্ত এই কবি তাঁর স্বভাব-স্বতন্ত্র ভাবনার শিল্পিত জগতটিকে অবারিত করে দিয়েছিলেন সেদিনকার বাঙলা পাঠকদের সামনে। তাঁর সমসাময়িক, তাঁরই মতো নদীয়া জেলার দশ বছরের বড়ো কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিংবা ন-বছরের বড়ো অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু তাঁর 'মিতা' যতীন্দ্রমোহন বাগচী, পাঁচ বছরের বড়ো বর্ধমান জেলার কবি কুমুদরঞ্জন কিংবা দু-বছরের ছোটো পারিবারিক-স্বজন কবি কালিদাস রায়ের মতো তথাকথিত 'মাইনর পোয়েট' ছিলেন না তিনি। বৃহত্তর বাঙালি পাঠকসমাজকে নিতান্তই 'রসের মোটা ভাত কাপড়' জোগাবার কবিকৃত্য পালন করেননি তিনি। তিনি ছিলেন তাঁর আর-এক সহযাত্রী কবি মোহিতলাল মজুমদারের মতো—অবশ্যই সে কথাটা কিন্তু তাঁর সমকাল এবং উত্তরকালও স্বীকার করেছে। তবুও তারই মধ্যে তাঁর উত্তরসূরি কেউ-কেউ তাঁর সম্পর্কে এক অন্যরকম বাঁকা-মন্তব্যও করেছেন। কল্লোল-পত্রিকাকে ঘিরে সেদিন বহুস্বরা আধুনিকতার যে বিচিত্র প্রকাশ তারই অন্যতম অগ্রণী প্রতিনিধি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ'-এ লিখছেন :

> 'মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এককথায় তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য, তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।'

পাশাপাশি যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লিখছেন,

> 'মোহিতলালের মতো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও আমাদের আরাধনীয় ছিলেন। ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাঙলা-সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা।'

উত্তরসুরি বুদ্ধদেব বসু যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন : রবীন্দ্রকাব্যের 'মায়াজাল' থেকে মুক্ত হবার প্রবল-ইচ্ছে-জাগা সেই 'আলো-আঁধারি' দিনগুলিতে 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে 'উজ্জ্বলতম সেতু'র মতো তিনি।

কবি নজরুলের দৃপ্ত কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার মধ্যে এই শতকের তরুণ কবিদের কাব্যচর্চা পেয়েছিল নতুন ইঙ্গিত। কি সেই ইঙ্গিত? বুদ্ধদেবের মতে :

> 'মোহিতলালের 'বিস্মরণী'র বড়ো-বড়ো তাল-তাল ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে চলা কল্লোলের পাশাপাশি যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে—সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব কষে গরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মতো সুর।'

তিনি আরও লিখেছেন,

> 'যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায় না। ... আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত, প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের হঠাৎ এক-একটি আলো-জ্বলা, রেখা-তোলা পংক্তি (রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা)—বিরল বলেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন! যেমন রবীন্দ্রনাথের অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে মোহিতলালের নির্ভয় দেশাত্মবোধে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি অন্যদিক থেকে যেন একটা নিঃশ্বাস-ফেলা নিষ্কৃতি ছিল যতীন্দ্রনাথের সরল বৈঠকী দুঃখবাদে। সৃষ্টির আনন্দময় অভিনন্দনে আবাল্য অভ্যস্ত আমরা সেই প্রথম শুনলুম ব্যঙ্গোক্তি, সংশয় নেতিবাদ।'

এই মন্তব্যেরই অনুসূত্রে তিনি আরও লেখেন, 'যতীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির থেকে কোনো গতিশীল চিন্তার সূত্রপাত হতে পারে না'। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে,

> 'সমসাময়িক বাঙলা কাব্যের উপরে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয় এবং সে প্রভাবও ক্ষণিক ও অদূরস্পর্শী। এতেই বোঝা যায় তাঁর দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান গুণ ছিল—অনুপ্রেরণার শক্তি নয়, প্রাপ্তিহারক রমণীয়তা।'

বুদ্ধদেব বসু-র 'কালের পুতুল'-এর এই কথাগুলি পাঠক একটু ভেবে দেখবেন : বাস্তবিকই যতীন্দ্রনাথের বিদ্রূপশাণিত বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গির উত্তরাধিকারটি উত্তরকালীন বাঙলা কবিতায় নিতান্তই নির্বীজ কিনা—কিংবা তাঁর বহু-প্রচারিত দুঃখবাদের ব্যাপারটি নিতান্ত 'বৈঠকী দুঃখবাদ' কিনা (ব্যাপারটা যে কি বুদ্ধদেব আদৌ তার বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাননি)—অথবা তাঁর এই দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান গুণ 'শ্রান্তিহারক রমণীয়তা' কিনা। তা যে নয়, তা যে আসলে দুঃখের অশ্রুমস্থ জীবন ও মানুষের প্রতি কবির এক অনির্বাণ উজাগর ভালোবাসা, পরম ইতিবাচক এক ভিন্নস্বর, আজ-পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথের অসংখ্য কাব্যরস-সন্ধানী সমালোচক এ সত্যটি অনুভব করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে পিঠোপিঠি জন্ম-নেওয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রনাথের থেকে পাঁচ-বছরের বড় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথের থেকে সাত-বছরের ছোট প্রমথ চৌধুরি এবং যতীন্দ্রনাথের থেকে এক-বছরের ছোট মোহিতলাল—রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ার মাঝখানে বেড়ে ওঠা এইসব বহুশাখাচারী সাহিত্য-সাধকদের কবিতার যে সাধনক্ষেত্রটি, সেখানে জগৎ-জীবন এবং মানব-সম্পর্কের নানাদিক সম্পর্কে স্পষ্ট, সময় ও সমাজসচেতন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছিল। তাঁদেরই পাশাপাশি যতীন্দ্রনাথ শোনালেন এক নির্বিচার নিমগ্নচিত্ত আধ্যাত্মিকতা এবং রোমান্টিকতা-বিরোধী 'দুঃখবাদী' জীবনদর্শনের এক নতুন সুর। আমরা আগেই বলতে চেয়েছি : সে দুঃখবাদ নেতিবাদী নৈরাশ্যপীড়িত কোনো জীবনানুভব নয়—তা জগৎ ও মানুষকে ভালোবাসারই এক বিদ্রূপশাণিত তির্যক জীবনদৃষ্টি।

মোট সাতষট্টি বছরের আয়ুষ্কালে তাঁর প্রথম ছাপা কবিতা (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯) এবং শেষ কবিতার (আসছে-জন্মে, মাঘ ১৩৬০) মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বছরের আয়ুষ্কালে পৌনে-তিনশোর মতো কবিতা সংকলিত হয়েছে তাঁর 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা' এবং 'নিশান্তিকা' নামের ছটি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে। তাঁর এই ছটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাজন-রেখা আমাদের চোখে পড়ে। 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' এবং 'মরুমায়া' কাব্যগ্রন্থের ১১৮টি কবিতার মধ্যে তাঁর প্রথম-জীবনের দুঃখবাদী পরিচয়টি যেমন নিহিত আছে, তেমনি তাঁর 'সায়ম্', 'ত্রিযামা' এবং 'নিশান্তিকা' কাব্যের (অনুবাদগুলি বাদে) কবিতাগুলিতে গাঁথা আছে তাঁর কবিচেতনার দ্বিতীয়-জন্মের কথা।

যে সময় পর্বটিতে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য আর গীতালির রবীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছেন জগতে আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাঁর ধন্য মানব-জীবনের কথা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার মাঝখানে শোনাচ্ছেন তাঁর রোমান্টিক সুদূরাভিসার আর অবিচল অস্তিক্যের কথা—তাঁর সহযাত্রীরা অনেকেই যেখানে সমস্বরে শুনিয়ে চলেছেন তার প্রতিধ্বনি, শোনাচ্ছেন তদ্‌গতপ্রাণ পল্লীমুগ্ধতার অবিরল পদাবলী, আর আঁকছেন পরিতৃপ্ত-প্রসন্ন গার্হস্থ্যের নানা কল্পছবি—সেই জিজ্ঞাসা-প্রশ্ন-সংকুল দিনগুলিতে, পুরনো বিশ্বাসের হেলে পড়া মিনারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন আর-এক আলাদা কবির ভূমিকায়। 'বিদ্রোহী' কবির শিরোপাটি আমরা সেঁটে দিয়েছি কবি নজরুলের গায়ে। কিন্তু তারও আগে ঈশ্বর-পৃথিবী আর ভালোবাসা-সংক্রান্ত তীক্ষ্ণ প্রশ্নপরায়ণ নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে 'বিদ্রোহী' যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। স্মরণ করা যেতে পারে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। 'কচিভাবের কবি' নামের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'তাঁর ভাষায়, বক্তব্যে, উপমা-অলংকার-চিত্রকল্পে এবং একটি নিজস্ব দার্শনিকতায় যতীন্দ্র (নাথ) সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-যুগের প্রথম বিদ্রোহী কবি।'

এই বিদ্রোহী কবি যতীন্দ্রনাথ বারবার নিজেকে বলেছেন 'মরুকবি'—বলেছেন 'দুখবাদী বৈরাগী'। যে আত্ম-প্রবঞ্চক, অফলা অস্তিত্বের চারদিক ঘিরে অজস্র মিথ্যার রঙিন বেসাতি, সেই মরুপ্রতিম অস্তিত্বের যন্ত্রণাবিদ্ধ এই কবি বারবার যে-কথাটা শোনাতে চেয়েছেন, তা হল অপরাজিত মৃত্যুঞ্জয় মানুষের গান—'শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য স্রষ্টা আছে বা নাই।' কেন তিনি দুঃখবাদী, কি তাঁর দুঃখবাদের স্বরূপ—তার সঙ্গে দার্শনিক শোপেনহাওয়ার, ইতালিয় কবি লিওপার্দি, ইংরেজি সাহিত্যের বেকন, জন ডান, বা টমাস হার্ডির দর্শন ও মনোধর্মের, কিংবা আমাদের ভারতীয় সাংখ্য ও বৌদ্ধ-দর্শনের কোনো মিল-অমিল খুঁজে পাওয়া যায় কিনা—এসব তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে ভেবেছেন সন্ধানী বিদগ্ধজনেরা। কিন্তু তাঁর কবিতার দিকে তাকিয়ে আমরা এটুকু দেখি যে, যতীন্দ্রনাথ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ জুড়ে কেবলই দেখতে পেয়েছেন এক অন্ধ জড়-শক্তির স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা—আর তারই অনির্বাচ্য, দুর্জ্ঞেয়-লীলায় আবহমানকাল ধরে নির্জিত নির্যাতিত হয়েছে অসহায় মানুষ। এই অবিচার আর অন্যায়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার রাস্তাটা তাহলে কি? এক অসামান্য শ্লেষ-শাণিত বিদ্রূপে তিনি আবিষ্কার করেছেন সর্ব পাপ-তাপ-হর তাঁর নব্য-নিদান : 'ঘুমিওপ্যাথি'। কবির ভাষায় 'এ ভবরোগের নব-চিকিৎসা আমার ঘুমিওপ্যাথি। 'সাতটি ঝোঁকে রচিত কবির সপ্তস্বরা ঘুমিওপ্যাথির এই নব্যনিদানে মূল উদ্দিষ্ট যিনি, তিনি কবির অনেকদিনের বাদ-বিসংবাদ আর অনুযোগ-বিতর্কের মানসযাত্রা-সহচর, 'বন্ধু'। কবির প্রতিপক্ষ, ঈশ্বর। কবির কনিষ্ঠ পুত্র তরুণকান্তি সেন বড় সুন্দর করে জানিয়েছেন কবির সঙ্গে তাঁর বন্ধুর দ্বন্দ্ববিধুর সম্পর্কটির কথা। 'কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : বন্ধুর খোঁজে' নামের একটি লেখায় তিনি জানাচ্ছেন : 'ঘুমের ঘোরের' প্রথম ঝোঁকে যতীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁর বন্ধুর দর্শন পান। কবির তখন যুবাবয়স। দর্শনমাত্রেই বন্ধুকে তিনি বসতে বললেন দুটো কাটাছাঁটা সোজা কথায়। এই কাটাছাঁটা সোজা কথার জের চললো বহুদিন। মরীচিকা, মরুশিখা পার হয়ে প্রায় মরুমায়া-র শেষ পর্যন্ত। 'সায়ম্' থেকে মনে হয় বন্ধুত্বের ধারাটা পাল্টাচ্ছে—অন্তত বন্ধুকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করার প্রবণতাকে অতিক্রম করে ফুটে উঠছে একটা গভীর অনুভবের আর্তি; ধরা পড়ছে একটা উৎকণ্ঠা—যা প্রায় প্রিয়-মিলনেরই আকুতির সমগোত্রীয়। জীবনের শেষ কবিতা 'আসছে জন্মে'-তে কবির স্বীকারোক্তি : 'রোঢ়াবাঁধে এসে বন্ধুবরের খবর নাই।' এই বন্ধুর পরিচয় কী? কে এই বন্ধু যে কবিকে কিছুতেই সুস্থিত হতে দেয় না—ঘুরেফিরে কবিতা লেখায়, তর্ক করায়, আবার দেখা না-দেবার দুঃখেও কাঁদায়? বলা বাহুল্য, এর সহজ এবং সম্ভবত সঠিক উত্তর ঈশ্বর। যতীন্দ্রনাথের বন্ধু যে ঈশ্বর, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তরুণবাবু তাঁর লেখায় খুঁজেছেন সেই ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার দার্শনিক উৎস। কিন্তু, যতীন্দ্রনাথের কবিতায় অবিরলভাবে ফিরে আসা এই বন্ধু-ঈশ্বর একান্তই নিরুত্তর। আর জগতের, মানব-সম্পর্কের, ন্যায়-অন্যায়ের, ধর্ম-অধর্মের, প্রেম-অপ্রেমের, প্রকৃতি ও ভক্তিমদমত্ততার যাবতীয় অসঙ্গতি

নিয়ে তাঁর বেদনাদীর্ণ নানা শ্লেষতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার একের-পর-এক নানা শায়ক ছুঁড়ে দিয়েছেন কবি তাঁরই উদ্দেশ্যে। সায়ম্ থেকে নিশান্তিকা পর্যন্ত 'শমিতদ্রোহ' কবির এই বন্ধুভাবনার ধরন এবং গড়নটি যে একেবারে পাল্টে গিয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার আগে মরুমায়া পর্যন্ত এই 'বন্ধু'কে সম্বোধন করে লেখা 'দুঃখবাদী' যতীন্দ্রনাথের মানুষের প্রতি অনিশেষ ভালোবাসার উচ্চারণের এই তির্যক শিল্পরূপ অবশ্যই পাঠকের অভিজ্ঞতার এক মহার্ঘ উপার্জন। জীবনের এই প্রথম পর্বেই ইঞ্জিনিয়ার-কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত করেছেন পথের চাকরি, ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে-প্রান্তরে, দেখেছেন দুঃখের আবর্তে হাবুডুবু-খাওয়া আর্ত মানুষের জীবন—তাই লোকনাথ শিব তাদের সহমর্মী কবির কাছে দেখা দিয়েছেন তাঁর আরাধ্য দেবতা হিসেবে। আর এই লোকায়ত জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতা কাজ করেছে কবির আলাদা ধরনের সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে। এই একই অভিপ্রায় তাঁকে প্রণোদিত করেছে পুরাণের জগৎ থেকে তুলে আনা কুশীলবদের নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে।

'সায়ম্' থেকে কবির যে আর-এক নবজন্মের কথা আমরা বলেছি, বাস্তবিকই সেই ভিন্নতর যতীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি তাঁর শেষ-তিনটি কাব্যের মধ্যে। একদিন যে-সুন্দরকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আজ কবির কণ্ঠে বেজে ওঠে তাঁর নতুন আহ্বান—যে প্রকৃতিকে মিথ্যা-মায়াবিনী বলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বলেছিলেন : 'বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কি বা/মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রিদিবা'—সেই প্রকৃতির রূপবৈভব, আজ তাঁর এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায় নতুন করে উপভোগ ও অনুভব করতে চাইছেন কবি। জীবনের প্রথম প্রহরে দৃপ্ত প্রতিবাদে কবি বলেছিলেন, 'প্রেম বলে কিছু নাই/চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।' কিন্তু আজ তাঁর মনে হয় : 'সেই সমাধান সমাগত যবে আজ/আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন চেতনার ঝাঁজ?' একদা তাঁর প্রশ্নাতুর জীবনের প্রথম প্রহরে যে নিরীশ্বর যতীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে বারবার তাঁকে বিদ্ধ করেছেন শাণিত নানা বিদ্রূপে, আজ জীবনের অন্ত্যবেলায় তাঁরই উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'সারা জীবনের নয়নাশ্রুতে/চিরসুন্দর দেখা দাও।' জীবনের শেষবেলায় 'নিশান্তিকা'য় আজও এই মরুকবি অকম্পিত বিশ্বাসে লেখেন, 'কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত/যে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত/আমি সে ব্যথায় চির ব্যথিত। ... কবি নহি আমি করিনি ছন্দে গ্রথিত/যে-বিধিবিধান প্রতিবিধানের অতীত/আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত।' আজ এই নিশান্তিকায় আমরা দেখি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে এক নবদ্বৈরথ। হয়তো তাঁরই হাতে তাঁর পরাভব—হয়তো 'এবারের সেই মুখোশধারীর/মায়াযুদ্ধেরই জয়।' তবু অনম্যমেরুদণ্ডী কবির এই অহংকৃত মানবিক উচ্চারণ : 'তবু যে যুঝেছি/আজও যুঝিতেছি সেই মোর গৌরব;/মানুষের মত মানুষেরই হয়/বারবার পরাভব।'

ব্যক্তিজীবনে মানুষ হিসেবে যতীন্দ্রনাথ যে আদৌ শ্রোতাপন্ন নয়, নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্যে যিনি আলাদা ধাতুতে গড়া অন্য-ধরনের এক আলাদা জাতের মানুষ—কবি হিসেবেও

তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তাঁর আপাত-রবীন্দ্রদোহী স্বরস্বাতন্ত্র্যে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাব : আদৌ রবীন্দ্রবিদ্বেষী বা রবীন্দ্রদ্রোহী ছিলেন না তিনি। জীবনের প্রথম প্রহরে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ এক অনুরাগ জন্মেছিল তাঁর মনে—সারাজীবন ধরে তাকেই তিনি আত্মসাৎ করেছেন তাঁর কবিতায় এবং ব্যক্তিগত জীবনেও। রবীন্দ্রানুভাবিত বিভিন্ন এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর কবিতাগুলিই তার প্রমাণ।

এর আগে যতীন্দ্রনাথের সব-কটি কাব্য নিয়ে তাঁর কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন ভারবি। তবুও সেই-কবিতার বিপুল সম্ভার থেকে তাঁর আত্মজনেরা এবং বর্তমান সম্পাদক মিলে নির্বাচন করেছেন এই 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র কবিতাগুলি। আশা করি, তাঁর ব্যঙ্গশাণিত, শ্লেষতীক্ষ্ণ কোমল কণ্ঠস্বরের বাদী-বিবাদী নানা সুরের সমন্বয়ে তৎসম তদ্ভব এবং একান্ত লোকায়ত দেশজ শব্দবন্ধে চমৎকার ছন্দনৈপুণ্যে গ্রথিত বাক্‌প্রতিমা ও অলংকারের আশ্চর্য কারুকৃতিতে গড়া এই কবিতাগুলি চিনিয়ে দেবে স্রোতের বিপরীত-মুখী জীবন ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ সেই চিরসাময়িক কবি যতীন্দ্রনাথকে।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সুশান্ত বসু

সুচিপত্র

মরীচিকা (১৯২৩)

মরুশিখা (১৯২৭)

মরুমায়া (১৯৩০)

নিশান্তিকা (১৯৫৭)

অনুবাদ কবিতা

বহ্নিস্তুতি

তপন-তপ্ত, চিরঅতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি!
শিবললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।
রক্তবসন, ভস্মআসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
কান্ত ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় কবি গো নতি।
শিখায়-শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে-রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধর মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।
বিদ্যুতে তবে ইঙ্গিত ঝলে, বজ্রে জাগিছে বাণী,
মানব চিত্তে, আণব নৃত্যে তোমারি সে টানাটানি।
বুকে-বুকে আর জঠরে-জঠরে তোমারি কঠোর দাহ,
প্রাণ হতে প্রাণে প্রণয়তন্ত্রী, তোমারি সে পরিবাহ।
জীবনে কি বনে, মাঝে-মাঝে তুমি জ্বলে উঠ দাবানলে,
বক্ষে-চক্ষে পেতেছ আসন তৃষ্ণার শতদলে!
ধুকধুক্ এই হৃদিমূলে তব ধিকিধিকি কৌতুক
সাগরে ডুবেও দগ্ধগিরির সমান দহিছে বুক!
শনির আঁখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়ত হানিছে শ্লেষ ;
অনাবৃষ্টিতে শুষিয়া জ্যৈষ্ঠে, ভাদ্রে ডুবাও দেশ।
দুর্ঘট মিল তুমিই মিলাও লোহায়-লোহায় জুড়ে ;
চিতার ফুল্‌কি উড়ে লাগে পুনঃ চিত্তের জতুপুরে!
দুর্দিনে তোমা সাধিয়া জ্বালাই সুদিনের সঞ্চয়ে,
সব সম্বল ভস্ম করিয়া উঠ যে দীপ্ত হয়ে।

আজ ভাবিতেছি তাই—
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই!
মিলন-বিরহ ভাব ও অভাব যোগবিয়োগের কাজ,
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,

বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেইকালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহারি ভালে?
হে সর্ব্বভুক, এ দীন শর্মীর লক্ষ প্রণাম লহ,
কঠিন-শীতল অন্তর তার আশিসদাহনে দহ।

শিবের গাজন

পাগলা শিবের বছুরে গাজনে
বেজেছে ঢাক!
কাল হবে দেনা-পাওনার কথা,
আজকে থাক
আগুন জ্বালিয়ে সন্ন্যাসী সবে
ওই 'ফুল' খেলে ব্যোম্-ব্যোম্ রবে ;
পিঠমোড়া বাঁধা খায় ওরা বুঝি
চড়ক পাক!
থেকে থেকে থেকে বাজে ঝোঁকে ঝোঁকে
গাজুনে ঢাক।

ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোমে লেগেছে রে ঐ
চড়ক পাক!
বন্-বন্ ঘুরে অনন্ত জুড়ে
কালের চাক।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাদল
লুটিযা-লুটিয়া ঘুরে নভোতল
আগুন ফুল্‌কি উল্কা উড়ায়ে
লাখের লাখ।
রশি ছিঁড়ে ছুটে ধূমকেতু দেয়
আগুনে পাক।

মাঝখানে তার রুদ্র-পুরুষ
কে নাচে ওই,
মরা বছরের বুকের উপর—
তাথৈ-থৈ!
চরণে ধ্বনিছে প্রলয়-ছন্দ,

নিমীল নয়নে সৃজনানন্দ,
ধবল অঙ্গে বিভল ভঙ্গি
মরণজয়ী।
ডম্বরু ডিমি মিশায়ে বিষাণে
কে নাচে ওই!
দিগন্ত হতে সভয়ে ইন্দ্র
জুড়িয়া কর ;
অরুণ বরুণ ধরণী নমিছে
চরণ 'পর।
আলোক-ছায়ার বাঘছাল ওরে,
খসিয়া লুটায় বনে-প্রান্তরে,
সিন্ধু ফণায় ফুঁসিয়া ফেনায়
মরণ-চর।
নাচে শিব, নাচে রুদ্র নাচে রে
মহেশ্বর।

নাচে শিব, নাচে সুন্দর নাচে
রুদ্রকাল!
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী, গলে
অস্থিমাল।
সাথে নেচে ফিরে আদি ও অন্ত,
ঘোরে দিক ওরে ঘোরে দিগন্ত,
সুখে-দুখে ঠুকে ঘুরপাকে বাজে
রুদ্রতাল।
উছলে গঙ্গা, হাসে শশী, দোলে
অস্থিমাল।

জড়জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া
হল 'বেভুল' ;
তথাপি পড়ে না পাগল শিবের
মাথার ফুল!
বল্ সন্ন্যাসী মুখ ফুটে বল্,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল?
রক্তনয়ন ডুবিছে তপন
না পেয়ে কূল।
দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের
মাথার ফুল!

ঘুমের ঘোরে

প্রথম ঝোঁক

এস তো বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা ;
তোমায়-আমায় হয়ে যাক দুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম ততো অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালি!
পৃথিবী ঘুরিছে বেমালুম যেন মাখম-মাখান পথে,
ছোট-বড় কত টানে অবিরত টলে না সে কোনমতে।
সৃষ্টি চৎমকার—
ঠোকাঠুকি নাই, গতি-বিজ্ঞানে, বাঁধা আছে চারিধার।
সে-দিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া,
লোহা-বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া!
দেখি চলিবার কালে,
গতি-বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে।

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
"ঠাকুরের আহা! অপার করুণা" কেঁদে-ফেঁদে তারা বলে
"দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।"
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপর বুঝিতে নারিনু লাভ হল কতটুক্!
একাকী ফিরিনু ঘরে,
প্রাণের দুঃখ যায় না কিছুতে, আঁখি আসে জলে ভরে!
ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
"প্রাণের দুঃখ না যাক কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।'
বন্ধু, প্রণাম হই—
শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঃঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম!
সেই জুড়াবার ঠাঁই ;
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
যুগ-যুগ ধরে কেন এ প্রয়াস গরমিলে মিলাইতে!
কোন যম নাই হিসাব করিয়া সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা ;

এ জগৎ-মাঝে সেই ততো সুখী, যার গায়ে যত ঘাঁটা!
বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হয়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা!
আমি বলি, কিনে কুলো—
পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দু-কানে গুঁজিয়া তুলো।

কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মার খোঁচা!
জানি তুমি ভালো ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয়-জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?
সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি আন ডালা ভরি ;
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে "তাঁর অপার করুণা, মরি।"
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
"গরু মেরে জুতা দান" অপেক্ষা নহে কভু বেশি পুণ্য!

প্রভাতে উঠিয়া বাহির হইনু সিক্ত গ্রাম্য পথে,
ঘুম ভেঙেছিল, এমন শপথ করিব না কোনমতে!
ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেতিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও করে ছুঁড়ে ফেলে।
বন্-বন্-বন্ ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন কেতেন সোজা ;
লাট্টু বলিছে, "হায় হায় হায়! ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা!
জীবন যে আসে ফুরায়ে"—
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরন—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেতিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা-লাট্টুটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টকবনে।

বন্ধু, এখনো ঘুম দাও, নহে কহিব অনেক কথা,
অনেকের 'পরে হইবে সেটা যে কঠোর নির্মমতা ;
ঈশা, মূশা আর বুদ্ধ,
কন্‌ফুসিয়াস-মহম্মদ বা কৃষ্ণ-নিমাই-সুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান ;

তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান ;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ ;
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল!
কি হবে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয়নাকো, একথা পাগলে বলে!

বড় কৃতজ্ঞ রব তোমা কাছে, হৃদয়-বন্ধু মোর,
চিরতরে যদি বুলাও নয়নে বিস্মৃতি ঘুমঘোর!
থাক বা না থাক স্রষ্টা—
নিখিল বিশ্ব ঘুরে-ঘুরে মরে, তুমি তার চির দ্রষ্টা।
ঘুরনের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চলে যায় দূরে,
তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারি হৃদয় জুড়ে।
অনিমেষ আঁখি 'পরে
তোমার অশ্রু তোমার হাস্য নহে সে মোদের তরে।
মোরা ভুল করে প্রণমি তোমায়, ভুল করে করি রোষ,
তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিকো অসন্তোষ।
আমরা তোমায় ডাকি,—
যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি!

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে—আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ,
কেন যে এসব আছে,
সে কৈফিয়ত তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মুরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিকো হাত।
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া-বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!
ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্ত যজ্ঞ-ঘোড়া ;
মোদেরি পাকান প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠান দড়ি ;
তারি সাহায্যে, বাসনা—তোমার যজ্ঞ-অশ্ব ধরি!

বন্ধু, আমার হৃদয়-বন্ধু, তবু তোমা ভালোবাসি ;
স্বপ্নবিহীন ঘুমের আড়ালে তুমি দেখা দাও আসি।
তখন তোমাতে থাকি,

বিয়ের বাজনা মরার কান্না মিছে করে ডাকাডাকি ;
শান্ত তখন শ্রান্ত হৃদয়, ক্ষান্ত তখন মন,
নাহি আশা-প্রেম নাহি আশঙ্কা সাঙ্গ সকল রণ।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারেনা বারোটার বেশি রাতি।
প্রেমে ও ধর্মে নাহি প্রয়োজন—বলিনে আমি এ-কথা,
মিথ্যামাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।
অসীম জড়ের মাঝে
চেতনা-শক্তি—ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে।

শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় ;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি-পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর!
সকল শক্তি সংহত করে হয়ে আছ মহাজড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতারি বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা ;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা।
জগতের শৃঙ্খলা,—
স্বপ্নেরি মতো উপরে-উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা!
বিচারে যখন ভিতরে-ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

দ্বিতীয় ঝোঁক

আজি দুর্দিনে ঝড়ে,
তোমায়-আমায় দেখা গো বন্ধু, পুনঃ বহুদিন পরে।
জলদগর্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাঁধি আঁখি,
শোন মোর কথা—ওসবের আমি তোয়াক্কা নাহি রাখি!
হান বর্ষার জল,
নিরন্ধ্র মেঘে ঘেরিয়া বজ্রে ভেঙে ফেল ধরাতল।
ও তর্জনের অর্থ বুঝিতে হয় না আমার ক্লেশ ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ!
জোড় করি দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহ না, সে জানি আমি
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

এ ধরা গোরস্থান ;—
মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু-দিনে ভূমি-সমান!
কতনা অশ্রু কত হাহুতাশ কত হাতে-পায়ে ধরা,
শ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কত না ফন্দি করা।
সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে, চলে যায় ঘুরে বায়স্কোপের ফিতা!
আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি।
আমারও দুঃখ-সুখ,
ধুলা হয়ে যাবে—চাহি না চাহি তোমার পাষাণ মুখ।
তোমারে নাহিকো দুষি ;
নিজ ধন নিয়ে পার করিবারে যখন যা তব খুশি।
একটি নিয়ম মান তুমি, সেটি কোন নিয়ম না রাখা ;
আঁখি মুদে দেখি, পাগলের মতো ঘুরিছে কালের চাকা!

যে দিকেই আমি যাই—
তার সাথে দেখা হবে পথে একা সহসা মরণ-ঠাঁই।
অতঃপর যে কি হবে তা নিয়ে নাহিকো চিন্তা-লেশ,
সহজসত্য আমার পক্ষে ইহকালেরই সে শেষ ;
চাহি না প্যাঁচাল যুক্তি—
অদৃষ্টসাথে উপায়-হীনের নিত্য-নূতন চুক্তি!
পূর্বকালে যা ছিনু আজ তার হয় না তো প্রয়োজন,
পরকালেতেও যা হবে তা হবে—কেন বৃথা আয়োজন?
মিছে দিন যায় বয়ে ;
উপরে ও নিচে ঘুমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে!
বন্ধু আমার, সব নিয়ে দাও তোফা ঘুম দিনে-রেতে ;
নাকের বদলে নরুন যে পায়—ব্যবসায় সেই জেতে।

বন্ধু, ত্বরিত যাও—
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসিপিসিদের মোর পাশে ডেকে দাও।
তন্দ্রিত চোখে দেখিতেছি তব স্বরূপ খোলস-ছাড়া—
দেবতা গড়িলে পাষাণে আর সে ঢালে না নিঝর-ধারা ;
চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে,
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর, জোগায় তোমারি পেটে!
গরু-পোষাণির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় করে কে পুনঃ কাড়িছে, হায়!
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,

দেঁতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক ;
অস্য অর্থটি—
যাহার পাঁটা সে যেদিকে কাটুক, তাতে অপরের কি?
ছোলা-কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এককোপে বলিদান—
পাঁটার মধ্যে সে পাঁটাটি—আহা কত না ভাগ্যবান!
পাঁটার দুঃখ-সুখ—
মার পায়ে দিতে নূতন সরায় রক্তে জমায়ে থুক!

চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
যদি বলি তুমি, সুখদুখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম!
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব-রোগের সব চিকিৎসা আমার "ঘুমিওপ্যাথি"।
ঝুম্‌ঝুম্‌ নিঃঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জমে আয়—ঘুমের উপরে ঘুম!
ঝিম্‌ঝিম্‌ নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন তো।
রিম্‌রিম্‌-ঝিম্‌ঝিম্‌—
পাকে-পাকে কসে কিসের বাঁধন সাপের মতন হিম!
ঘর্‌ঘর্‌ শাঁইশাঁই,
আর ভয় নাই নাই ;
আঁধারের ঢেউয়ে ওই ভেসে এল জমাট ঘুমের চাঁই!
নাই উঁচুনিচু নাই আগুপিছু—
নাই সুখদুখ আলো-কালো কিছু ;
নিতল হইয়া ডুবে নেমে যাই—দাঁড়াবার নাই ঠাঁই।
ডানে-বাঁয়ে মোর ব্যাস-বাল্মীকি
ছেড়ে বকাবকি মিছে লেখালেখি,
সব সাধনার অন্তে বুঝেছে ঘুম পদার্থটি কি!
কেন আর গোলমাল?
বন্ধু, এবার বন্ধ হল কি বুকের কামারশাল!
চির-নীরবতা চাই—
দোহাই তোমার, মাঝে-মাঝে আর ঘুম ভাঙিওনা ভাই!

তৃতীয় ঝোঁক

আজিকে সুখের দিনে,
তোমার দুয়ারে এসেছি বন্ধু, স্বপ্নের পথ চিনে।

পথের দুধারে দুলিছে দেখিনু ঘনছায়া তরুশ্রেণী,
এলায়ে দিয়েছে পিঠের উপরে পুষ্পিত লতাবেণী ;
পিক-পাপিয়ার দল
হৃদয়-মাতান মধু-সঙ্গীতে ভরে অম্বরতল।
খেয়ালের বশে কুড়াইনু ধূলি, হল সে সোনার কুচি,
ক্ষুধা না পেতেই কোথা হতে এল গরম ফুল্‌কো লুচি!
এ হেন সুখের দিনে
খোস খবরটা শুনাব কাহারে বন্ধু গো তোমা বিনে?
আঝিকার শুভরাতে
বদ্ধ হইব পরিণয়-ডোরে সৌভাগ্যের সাথে।

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ নক্ষত্রের বাতি,
রাহুকে বল—সে গিলুক সূর্যে, না কাটে যেন এ রাতি।
বজ্রে বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার শিরে,
কণ্ঠের হার রচ গো তাহার তড়িতের তার ছিঁড়ে।
পূরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জ্যোৎস্না ধুনিয়ে রচ তাহে রাঙা বাস।
সোহাসে গলিয়া অঙ্গে ঢলিয়া প্রিয়া কানে-কানে বলে,
তোমাতে-আমাতে বদ্ধ হইনু অক্ষয় শৃঙ্খলে।
বন্ধু, ভুলিনি আমি—
পবন করিছে ব্যজন তবুও ললাট উঠে যে ঘামি।

কোথায় হতে তুমি এলে গো লক্ষ্মী! কোথা ছিলে এতদিন!
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হল ভিটাহীন?
আমার দীপালি রাতি,
উজ্জ্বল আজি কতনা জীবের নিবায়ে জীবন-বাতি!
অশ্রু-সাগরে শোভে সহস্র নয়ন-কমলদল,
তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণ-তল!
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক-বিভাবরী!
ভরেছ আতর-দানি,
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল-মর্ম নিঙাড়ি ছানি?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্যছিন্ন শিশু-কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

মিটেছে সকল আশা—
দিয়েছি নিয়েছি হরেক রকম সুখ-দুখ ভালোবাসা।

ফুরায়েছে সব অশ্রু ও হাসি, জুড়ায়েছে বহু জ্বালা,
আর কেন বৃথা করি বক্তৃতা—এ যে বারোয়ারিতলা!
প্রকাণ্ড ধরা ভাড়াটে মহল—মরণ আদায়কারী,
পলে-পলে তার চোখরাঙানিতে জীবন যাপিতে নারি।
সহে না বেঁচে থাকা—
বাপ পিতাম'র মামুলি ধরনে প্রতিদিন মরে রাখা!
মরণও, সে যদি এইরূপই হয় তিলে-তিলে বেঁচে যাওয়া!
অন্ত কোথায় ভেবে হাসি পায়,—এল কি ঘুমের হাওয়া?

ওই যায় বুঝি শোনা—
খস্-খস্-ঠক্ চলেছে চলেছে তাঁতিদের তাঁত বোনা।
এ হাত ও হাত ফিরিতেছে মাকু—ধৈর্যের নাহি চ্যুতি,
কার সুতা খুলে দিয়ে বুক থেকে কার তরে বুনে ধুতি!
কোন মাকুটার দশ টাকা জোড়া কোনটার দশ সিকা—
লোহার মাকু সে লোহাই রয়েছে জন্মায় অহমিকা।
দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতির টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে!

চতুর্থ ঝোঁক

হায় রে ভ্রান্ত কবি!
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি!
সারাজীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা ;
জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদি-রক্তের আলিপনা?
দহিলে আপন রূপ
কোন্ অজানার পূজা-উপচারে অমল গন্ধধূপ!
এই অফুরান স্নেহ,
পঞ্চপ্রদীপ ভরিয়া জ্বালায়ে ধরিলে আপন দেহ!
পেয়েছ কি সেই লক্ষ্মীর দেখা হয়েছে কি বর চাওয়া,
কত দক্ষিণা মিলিল গো বিনা ফাঁকা দক্ষিণা হাওয়া?
ছেঁদো কথা কয়ে গেল দিন বয়ে আপন ছন্দে বন্দী,
পেয়েছ তৃপ্তি! প্রবলের সাথে একতরফা সে সন্ধি।
অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি শোন মোটামুটি কোনখানে সে যে নাই।

সে কেবল মরীচিকা!
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা।
প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছি নিজ গলা,

সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা!
কেন এ প্রয়াস ভাই,
যে কথা তোমার হলনাকো বলা, নেই সেই কথাটাই!
অসীমের তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে ;
নূতন-নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে!
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান!
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর-নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা!

কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবীণা—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি!
কালোকে দেখাবে কালো করে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ-ফেরানো গুঁড়ো!
খেলোয়াড়ি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম ভেদিয়া মর্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম-ব্যথা?
এ কথা বুঝিব কবে—
ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে!

বন্ধু, কোথায় ছিলে?
স্বপনের ঝোঁকে একঝাঁক পাখি মেরেছি একটি ঢিলে।
উড়ে গেল পাশ দিয়ে,—
কিন্তু এবার ত্রাণ পাওয়া ভার—মরিবে বাসায় গিয়ে।
বন্ধু গো, আর ভাঙায়োনা ঘুম, কতবার বল বলি?
মার খেয়ে কবে হাড় গুঁড়ো হবে, যেমন অপথে চলি।
বন্ধু, বন্ধু গো,—
গর্জিয়া আসে আমার পাশে কি মরণ-সিন্ধু ও?
নিষেধ কর সে অত করে যেন শোরগোল নাহি করে ;
ঘুমের অতলে টেনে নিক বলে—যেমন কুমিরে ধরে!

পঞ্চম ঝোঁক

তোমাতে-আমাতে বহুদিন হতে হয়নিকো কোন কথা,
ইদানি, বন্ধু, পাঁজরে একটা ধরেছে নূতন ব্যথা!
ডাকি ডাক্তারে, শুনে ঘাড় নাড়ে, কবিরাজ বলে 'হুঁউ'!
সহিয়াছি সাঁঝে মাখম সেখের মুখামৃতমাখা ফুঁউ!

কিছুতে কমেনি ভাই—
এই প্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা কব দুটো তাই।
গোপনে তোমারে কহিব কারণ, ব্যাপার হচ্ছে এই—
গত বসন্তে গলা ভিজাইতে একটি চুমুক নেই!
কি কব তাহার জোর—
বছর কাটিল, কাটিল না তবু বিষম নেশার ঘোর।

সহসা সেদিন—বেজায় কুদিন, সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
ঘাড়-মোড় ভেঙে ড্রেনের ভিতর পড়িলাম একেবারে!
কাদা মেখে উঠি নেশা গেল ছুটি, পাঁজরে বিষম ব্যথা ;
গুনে দেখি ভাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে কোথা!
কথা নহে বলিবার ;—
আপনিই তাই গোপনে সেখানে জুড়িনু ভেড়ার হাড়!
উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙান চামড়া-পটি ;
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খট্‌খটি!
হল হাড় জ্বালাতন ;
তোমায়-আমায় প্রাণের কথায় হবে তাই প্রলাপন।

প্রাণের কথা যে কয়ে যাই নিজে—বাজে কি তোমার প্রাণে?
প্রাণের কথার অর্থ খুঁজিলে মিলে তব অভিধানে?
জানি জানি সব ফাঁকি!
তবুও খোঁচাই ; তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছুই বাকি।
আমার প্রাণটা যতদূর যায়, যতদূর যেতে পারে,
তুমি ছাড়া আর সাধ্য কাহার সেথা সাথে যাইবারে?
জীবনের মূল খুঁড়িতে-খুঁড়িতে যত তলাইয়া যাই,
জীবনের ফুল খুঁজিতে যখনি আকাশটা হাতড়াই,
সকল সময় রহস্যময়! তুমি রহ পাছে-পাছে,
হে চিরপ্রহরী, তোমারেই প্রাণ বন্ধু বলিয়া বাঁচে।
বার বার জাগরণে।
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।

গুপ্ত ব্যথায় সুপ্তি না হয়, সন্ধ্যা তন্দ্রাভারে,
হেরিলাম কাল—নির্জীব আমি পড়ে আছি একধারে ;
চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো-আঁধারের গরাদে বসান অপার বিশ্ব-কারা!
এরি মাঝে ঘুরে তারকা-তপন বহিয়া কাহার বোঝা ;
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা!

পথ নাই পালাবার ;
উঠে পড়ে ছুটে, ঘুরে-ঘুরে লুটে, কেবল শ্রান্তি সার।
যুগযুগান্ত ভ্রমণক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁকি খুঁজে কত মহা-তপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি!
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস-ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার,—
যত যেতে চাও ততো যাও, শুধু বেড়ার মিলেনা পার।

মশার কামড়ে শুই পাশ ফিরে, নিশ্বাস লই টানি ;
দেখিনু সকলে সে অকূল 'জেল'-এ টানিছে বিপুল ঘানি!
কট্-কট্-কট্ চোখ বাঁধা গরু দূরে-দূরে ঘুরে মরে,
খুঁটির চরণে বিশ্রামহীন বিশ্বের তেল ঝরে ;
খুঁটি সে নির্বিকার!
ভাবটা এমনি, তেলে কিছু যেন প্রয়োজন নাই তাঁর।
অনেক দিনের আলাপ আমার, বন্ধু, তোমার সনে,
ঘানির উপরে শুতে দাও মোরে, গাহিব আপন মনে ;
গাহিব ঘানির গান,—
পাষাণের ভারে কেমনে যে বাড়ে তৈলের পরিমাণ।
তোমারি সে পরামর্শে,
গত বৎসরে, প্রাণের ভিটায় পাইনু যে-কটা সর্ষে ;
মনে ভাবিতেছি ঢেলে দিব আজ তোমার ঘানির খোলে,
ভীষণ পেষণে টোপাবে তৈল তোমারি পায়ের কোলে!
তন্দ্রার ভারে পাশ ফিরে চোখে পড়িল পুনর্বার,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার।
উঠে চারিদিকে চিরবন্ধনে ক্রন্দন-কোলাহল,
চরণে-চরণে বাজে ঝন্‌ঝন্ সুকঠিন শৃঙ্খল।
বন্ধু, কি তব ফন্দি,—
প্রহরে-প্রহরে প্রহরায় ফিরে—তারাও কারারই বন্দী।
সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি ;
শ্যাওড়া-তলায় ফুটে চেয়ে থাকে সখের সূর্যমুখী!
বন্ধু, আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখ,
এতবড় খাঁচা—মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ করোনাকো।
সীমা নাই যার, নাহিকো দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে-গাছে দাঁড় হাজার-হাজার, দাঁড়ে-দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি?
কয়েদে যখন—ব্যবস্থা কর—কয়েদিরই মতো রাহ।

নচেৎ মুক্তি দাও—
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে খুলে নাও।
জীবনে-মরণে কর্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন ;
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন
বুঝি প্রয়োজনে বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি,
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভরে কেঁদে ধুয়ে-মুছে দেব নিজে-গড়া অপরাধ।
যদি ভালো লাগে, ভালোবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু বলে,
সমানে-সমানে ছলনা-বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

চাহিতে মুক্তি হাসি আসে, হায়! পাকাইতে কাঁচা হাত—
কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ?
কেমনে আমারে বুঝাবে বন্ধু, কেমনে বুঝি এ কথা,
কোমল গড়ান যে বুক, সেখানে কেন সুকঠিন ব্যথা?
মোর চেয়ে কেবা জানে?
হাতুড়ি পেটার পূর্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে!
কিন্তু আমি যে মেপেছি বন্ধু, লোহার প্রাণের তাপ,
চৌদিকে তার দেখেছি ছড়ান ফুলকির অভিশাপ!
যে রয়েছে জেগে তার কাছে, ভাই, যুক্তিটা নহে খাঁটি,
ঝাঁঝরা গড়ান, পুড়িয়ে-পিটিয়ে আস্ত লোহার পাটি।
বন্ধু, করুণা কর,—
তন্দ্রার জাল ছিঁড়িয়া ডুবাও ঘুমেতে গভীরতর।

ষষ্ঠ ঝোঁক

ক'বছর ধরে, বন্ধুর দোরে পড়ে আছি দিয়ে ধন্না,
বন্ধু বোধহয় নারেন চিনিতে, ফিরেও তো কথা কন না!
রাজা-রাজড়ার কাণ্ড সকলি—স্তুতি-প্রণতি ও ভক্তি,
জয়-জয়-জয় সবাই চেঁচায় কণ্ঠে যতটা শক্তি।
দেখাশোনা নেই তবু সকলেই ভক্তি ও প্রেমে হারা,
যেখানে যা পায়, খুঁটে-খুঁটে খায়, চোখে বহে জলধারা।
না হয় আজিকে কাঙাল হয়েছি, ক্যাঙালি তো আমি নই,
সকলের সাথে পাতাপাতি করে প্রসাদ বাঁটিয়া লই।
হেথা হতে মোর পলাতে হইল, আগাগোড়া সব মিছে,

অশ্রু জমায়ে গড়ায়ে যে আঁখি, কেন ঘোরা তারি পিছে।
ঘুমের শরণ নিয়েছিনু আগে, সেটাও দেখি যে ফাঁকি,
ঘুম আসা আর না আসা—সেখানে আমারি বা হাতটা কি?

উড়ে যায় আয়ু কালের আকাশে—ডানায় শব্দ নাই,
খসে পড়ে বুঝি দেহের পালক, সে ভয় সর্বদাই ;
ওগো কল্পনা, সাথে-সাথে চল—হালকা তোমার পাখা,
কানে-কানে তারে বলে দাও, ও রে! সামনে সকলি ফাঁকা!
ধীরে গো বন্ধু, ধীরে!
দেহটা পিছায়ে পড়ে গেল কিনা—দেখা ভালো ফিরে-ফিরে।
অকূলের মাঝে বারেক হারালে, আর বৃথা তারে খোঁজা!
যার যৌবনে ফাগুন কাটালে সেটা কি এমনি বোঝা?
কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে-ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাঁসা-কাঁদা গলাগলি!
নব ফরমাস, দিই তোমা, সাজ কলকের পর কলকে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক পল্‌কে!
ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায়, ওই ছুটে যায়—লক্ষ মরণ ঘোড়া,
প্রেমের বল্‌গা বৃথাই কসিছে সোয়ার সে জোড়া-জোড়া।
ঢেলে সাজ, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো!

সপ্তম ঝোঁক

তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে,
হয়তো তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে আগে!
যাহা আছে যার, তাহা ছাড়া আর কি পারে সে পরে দিতে?
অপার দুঃখ তোমা হতে তাই ঝরে পড়ে চারিভিতে!
হে বিরাট! আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর ;
চিরবর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান আঁখিলোর!
ওগো অক্ষয় বট!
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।
তাই কাঁদাকাটি মাথা কোটা-কুটি সকল জগৎময়,
দুঃখ হইতে জনম এদের, দুঃখেই পরিচয়!
সকল দুখের খনি!
শিহরিয়া উঠে পরান, তোমার ব্যথার অঙ্ক গণি।

সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে!
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছ ঘুমিওপ্যাথির বলে!

আনন্দ নহ নহ ;
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ—দুঃখেরি ফেরি বহ!
যা প্রত্যক্ষ নিঠুর দুঃখ, তারে মায়া-ভ্রম বলি,
টেনে-বুনে তারে আনন্দ বলে আপনারে কেন ছলি?
চোখ বুঁজে যারে আনন্দ বলে, আনন্দ কর দাদা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা?
বেদ-বেদান্ত প্রাণ-প্রাণান্ত আফিং-গাঁজার চাষ,—
খুব সস্তায় তাঁর আশেপাশে হয়নাকো বারমাস।
কিছু আনন্দ কিছু সুখ আর বাকি আঁখিভরা জল,
তোমার-আমায় যেমন কাটিছে তারো তাই অবিকল!
অশ্রু পরশি অগত্যা আজ করিলাম আধাসন্ধি ;
হে চিরদুঃখী! ব্যথার বাঁধনে ব্যথিতে করিলে বন্দী!
প্রণাম প্রণাম—ভাই!
শত ঝঞ্ঝাটে তোমা হেন যেন অঘোরে ঘুমাতে পাই।

আবেদন

ওগো নিখিলের রানি!
কোন্ পথে তব কর্মশালায়
দিব আবেদনখানি?
উপন্যাসের বণিকের মতো
মিছা মানিকের লোভে হই হত!
মনে নাই আর ঘরে ফিরিবার
মায়াসঙ্কেতবাণী।
খোল গো দুয়ার কর্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা।
শুধু শুনি কানে হৃৎস্পন্দনে
দূর-হাতুড়ির ঘা।

ধোলাই-রঙাই ঘর,—
যেথায় কোমল স্বপ্নের রঙে
রাঙিছ ইন্দিবর!

বর্ষামলিন যত মেঘবাসে
কাচিয়া শুকাও শারদ আকাশে,
কিরণে ডুবায়ে নিতেছ ছোবায়ে
মেঘগিরিনির্ঝর!
খোল গো দুয়ার কর্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা!
রঞ্জিত তব বসন ছড়ায়ে
ভর হৃদি-আঙিনা।

গন্ধ চোলাইখানা,
দূর অতীতের পূর্বজনমে
ছিল মা আমার জানা।
কোন্ রসায়ন গূঢ় কৌশলে
মিশাইয়ে শুধু মাটি আর জলে,
শিকড়ের নলে গোলাপে-কমলে
চুয়ায় গন্ধ নানা!
খোল গো দুয়ার কর্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা!
কোটি ফাগুনের সুরভিসুরায়
উঠে প্রাণ মাতিয়া!

মা তোর জোড়াই-ঘর,
শুক্তি মুড়িয়া মুক্তা যেথায়
গড়িছ নিরন্তর!
ক্ষুদ্র এ দেহে করিছ যুক্ত
সীমাহীন প্রাণ অবাধ মুক্ত—
যুগ-যুগ যায়, শত সাধনায়
জোড়ের মেলে না স্তর!
খোল গো দুয়ার কর্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা!
অণুতে যে আর জুড়ে-জুড়ে অণু
দূরবীনে ধরে না।

গালাই ঢালাইশালা,—
নক্তন্দিব রয়েছে যেথায়
রক্তবহ্নি জ্বালা।
অগ্নিগিরির চিম্‌নির মুখে
রুদ্ধ বাষ্প থেকে-থেকে ফুঁকে ;

গোপন শুষ্ক সাগরের ছাঁচে
গলান পাহাড় ঢালা!
খোল গো দুয়ার কর্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা।
অঙ্গার যেথা হীরা হয়—সহি
প্রাণান্ত বেদনা!

তব বিদ্যুতাগার—
অসংখ্য বাতি জ্বলে দিবারাতি
ভরিয়া অন্ধকার।
কোথা সে চক্র ঘুরে সারাবেলা—
বজ্র যাহার স্ফুলিঙ্গ-খেলা ;
যার উত্তাপ-হরণে ব্যজন
চলিতেছে ঝঞ্ঝার !
খোল গো দুয়ার কর্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা।
কোন্ তড়িতের স্রোতসঞ্চারে
কেঁপে-কেঁপে উঠে গা!

ওগো নিখিলের রানি!
বিনা বেতনের দাস হতে চাই—
লহ আবেদনখানি।
কেবল বিলাস-অলস শয়নে
রব না আকাশকুসুম চয়নে!
ফুল ফুলাইয়ে পাখা দুলাইয়ে
গাঁথিব না শুধু বাণী ;
কর্মশালার সর্বদুয়ার
খুলে ডেকে লও মোরে,
কর্মের তাপে ঘর্ম ঝরুক
শিলাজতু নির্ঝরে!

হাট

দূরে-দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট ;

সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পূবের মাঠ ;
দূরে-দূরে গ্রামে জ্বলে উঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে!
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ-বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ান সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি করে কেউ নিল ভরে,
কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে!

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি পরখের ছল—

বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল
কত ক্রেতা-বিক্রেতা!

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী
নিত্য নাটের খেলা
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা।

নব-নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ
নব-নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া
সকল কর্ম তোর!
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর
শ্লথ আঁচলের-প্রায় ;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্ধশয়নে
আধখোলা জানালায়।

দু'পর বেলার রুপালি রৌদ্রে
ফুলদল পড়ে নুয়ে
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি
উড়ে যায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া
গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো
ঘুরে বেড়া মোর কাছে!

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র
ঝিঁঝির পাখার মতো,
অগ্নিকুণ্ডে জ্বালি কে হাপরে
ফুঁ দিতেছে অবিরত!
দিকে-দিকে-দিকে, জানি না কি পাখি
হাতুড়ি ঠুকিছে তালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা
গড়িছে বিশ্বশালে!

কালো দিঘিজলে গাহন করিতে
নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জন ঘাটে
জাগিছে এ কার মায়া ;
মরীচিকা চাহি শ্রান্ত পথিক
ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে
ছাড়ে না অশথতল।

আজিরে বিশ্ব কি মধু-মধুর
মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার
ঘূর্ণিহাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হয়ে
আঁকা পড়ে দূর পটে ;
কল্পনা তার গুন্‌গুন্ করে
অলিগুঞ্জনে রটে!

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে
শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিহর
মিলন-স্বপন দেখে!
সুদুর অতীত কাছে আসে আজ
কি গোপন সেতু বাহি ;
অদেখা-অগম দাঁড়ায়েছে যেন
মোর মুখপানে চাহি!

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা
সাহারা-প্রান্ত হতে,

এসেছে রে তারা কোন্ বসোরার
খর্জুরবীথি পথে ;
কত বেদুইন পার করে মরু
দীপ্ত অগ্নি ঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরানী বালা!

মর্মরে গাঁথা মর্মবেদিতে,
কে পাতি পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ
ঘুমে ঢুলে পড়ে মাথা!
আঁখি মুদে একা পড়ে আছি এই
সুখস্মৃতি ঘোর নীড়ে,
প্রাণ ভরে যায় চেনা-অচেনার
মিলনমধুর ভিড়ে!

বেলা পড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে
ভরিতে সাঁজের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল
চ্যুত ছায়া-অঞ্চল।
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে
নিদাঘ নিশীথ ঘোর,
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয়
সকল কর্ম-ডোর।

বারনারী

ধরণী তোমার প্রমোদপ্রবাস,
বাঁধনিকো হেথা ঘর ;
বিশ্বসুদ্ধ বুকে টেনে, বল
সবাই আমার পর।
নিষ্কলঙ্ক-নিকষ হৃদয়
প্রেমলেখা-রেখাহীন ;
রূপের গরব ভেঙেছ, করিয়া
রুপা হতে তারে দীন।

অজেয় অতনু ফুলধনু টানি
এসেছিল তব পাশ,
রুষিয়া ভস্ম করনি, আছে সে
দ্বারে বাঁধা ক্রীতদাস।
মায়ার অতীত অয়ি মায়াবিনী,
কতই না রূপ ধর ;
যৌবনখানি বসনের মতো
খুলে রাখ, তুলে পর!
কার কল্যাণে করে কঙ্কণ
সিন্দুর সিঁথা 'পরে ;
অমর কাহারে বরিয়া লয়েছ
বিশ্ব-স্বয়ম্বরে!
ধরণীর বুকে চরণ আঘাতি
নাচ যবে নানা ছাঁদে,
পা-দুটি জড়ায়ে মায়া-মমতায়
নূপুর বৃথাই কাঁদে।
ফুলধূলিমাখা অয়ি ভৈরবী,
কোথা তব বাসভূমি?
প্রেমে নেমে এল মন্দাকিনী যে,
তাহারও ঊর্ধ্বে তুমি?
হে বহ্নি! ওই লালসা লইয়া
পুড়ে পতঙ্গদল ;
সমিধ জোগালে জ্বলিত তোমাতে
উজ্জ্বল হোমানল!
স্নেহ-প্রেমাতীতা হে নির্লিপ্তা,
নাহি তব সুখদুখ ;
পুণ্য তোমারে করে না লুব্ধ,
পাপে নাহি কাঁপে বুক!
নহ মা ঘৃণ্য, কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটি—
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি!

মানুষ

পাঁচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিকো আঁটে।
গাভীর পুচ্ছ ধরি যারা তরে বর্ষানদী,
জুটে না পারের কড়ি ;
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায়-কাঁটায় পড়ি।
ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের করগো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ দুপ'রে গলদ্‌ঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কত না ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপটি ;
আশা যার ভাসে আকাশে-আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণী-গর্ভে ধন ;
বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধুলা-কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের, শ্রদ্ধা কর,
তারা মানুষেরি ভাই!

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক্—
জুটে নাই হেন বাস ;
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ ;
যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমাঁনি যে সহে বক্ষ পরে
লক্ষ দুঃখ-ঝড় ;

মাঝপথে যার শিরে নিয়ে বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—
ঘৃণা কি কামনা কোরোনা তাদের, কর গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী!

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;
আশি শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির-নাবালক চাষা!
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;
বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি!

মন-কবি

কাব্যবিহীন মন-কবিরে!
ডুবে থাক এই ডোবা গভীরে।
নূতন সত্য আর
নাই তোর শোনাবার—
সে-কথা চেঁচিয়ে বলে আপনার হবি রে!
লেখা তোর ছাই—সে তো
জানে, তবু চাইছে তো,
এঁকে যাও, বেপরোয়া হিজিবিজি ছবি রে!
'বাক্য' উলটি নিলে
'কাব্য' আপনি মিলে—
এ কাজও না পার যদি, মর গে আফিং গিলে।
বঙ্গবাণীর সাথ
যেদিন অকস্মাৎ
কমল-দ্বীপান্তরে হয়ে গেল সাক্ষাৎ।

যেমন ছুঁয়েছি পা,
চমকি উঠিল মা ;
কঠিন পরশে মার চরণে লাগিল ঘা।
কমল হতেও যার অধিক কোমল পাণি-
তারাই পূজেছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী।
তা বলে কি কর্বি—
ওরে হতগর্বী?
কিছুদিন ধরে হাতে লাগা তেলচর্বি!
পেতে নে রে শয্যা,
দেখে শেখ্ চারিদিকে ঘটতেছে রোজ যা!
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে ;
তুইও তাই বলবি ;
বাঁধা পথে চলবি—
আগে-পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছলবি।
যত কথা লিখে যায় মহাজন অন্য,
তুই না টুকিবি যদি, সে কথা কি জন্য?
এ কথাটা বোঝনি—
যাই কর—কেটে যাবে জীবনের রজনী।
মাঝে-মাঝে সাঁঝবেলা
ভিতরে কি দেয় ঠেলা—
হলেও তা হতে পারে মহাকাব্যের ডেলা।
প্রথমেতে না পোষায়, না পোষাক খরচা—
ছেড়োনাকো ছেড়োনাকো চর্চা।
হাতে থাকে সঙ্গতি, কানে যদি ছন্দ—
না হয় হইলে কবি, কথাটা কি মন্দ!
ভয় কি, ভুলে যদি ভবিষ্য-ভবীরে,
তুই তো তখন নাহি রবি রে—
কাব্যবিহীন মন-কঁবি রে!

সংশয়

বাধাহীন পথে স্বাধীন যাত্রী উড়ে চলেছিনু একা,
নব-বসন্তে কুটিরোপান্তে ভাগ্যে দুজনে দেখা!
চাহিনু কুঞ্জে, মুক্ত কাননে,
পিঞ্জরে, তব মুগ্ধ আননে,
চমকি বলিনু চিনেছি তোমায় চিনেছি—
চকিতের শুভদৃষ্টিমূল্যে
অপরিচিতা গো, চিরপরিচয় কিনেছি।

হায় সখী, সেকি সত্য যে আজ মিলিয়াছে পরিচয়?
মাঝে-মাঝে ভয় হয় না কি মনে,
কি ফাঁকে কখন কে পলায় বনে?
কাছাকাছি দুই খাঁচায় দুজনে দুলিয়া,
চিরকাল তরে আকাশ কি গেছি ভুলিয়া?

মিলন স্বপনে চমকে জাগিয়া পাও না তাহার দেখা কি-
পরান নিভৃতে জেগে বসে এক বন্ধনহীন একাকী!
এই প্রাণপণ প্রণয়ের মেলা,
সে তারে কেবল ভাবে ছেলেখেলা ;
সে চলেছে যেন জীবনে-মরণে ছুটিয়া,
নূতন নূতন মিলনে বিরহে
অসীম পথের পাথেয় লুটিয়া-লুটিয়া!

পায়ে-পায়ে তাই কষেছি শিকল, হয় যদি কভু ছিন্ন,
থেকে যাবে চির-রক্ত-নিবিড় গভীর বেদনাচিহ্ন।
জন্মান্তের মিলনের রশি
আর কারো সনে বেঁধে দিলে কষি,
চমকিয়া যেন কেঁদে উঠি মোরা জাগিয়া ;
তোমার-আমার এই জনমের
বিরহ-ব্যথার লাগিয়া, তীব্র লাগিয়া!

আহুতি

তোমাতে দিলাম আমার আহুতি, হে চির-বহ্নিশিখা!
সকল ব্যর্থ প্রয়াস যেখানে লিখিছে মৃত্যুলিখা।
খাঁটি যে সে হয় উজ্জ্বলতর তোমার পুণ্যস্নানে,
তোমার দহন মাটির প্রাণের কালিমা ফুটায়ে আনে ;
বিফল সাধনা সফল বেদনা তোমারে দিলাম তাই,
দুঃখ-নিরাশা ধোঁয়া হয় যাক, সুখ-আশা হোক ছাই।

কুসুম চয়ন করিনি তা নয়, গাঁথিতে চাহিনি মালা ;—
আদরে কণ্ঠে তুলি কেহ পাছে পায় কণ্টকজ্বালা।
হয়তো বালিকা দোলাবে বক্ষে মিলন-সাঁঝের ঘোরে,
বাতায়ন-পথে ছুঁড়ে ফেলে দেবে মলিন বিদায়-ভোরে,
নিপুণ মালার দ্বিগুণ জ্বালা যে, বুঝিয়াছি আমি সার—
তোমার ভস্ম ছাড়া এ বিশ্বে নশ্বর সবি আর।

তোমার শিখায় না করিয়া ভয় তাই সাজালাম ডালি,
ফুল-চন্দন, বেলকাঁটা, হবি—সবি দিব তোমা ঢালি।
স্বর্ণ আপনি হয় উজ্জ্বল তোমারে করিয়া ম্লান,
আমারি মতন অঙ্গারে দহি আছ গো জ্যোতিষ্মান!
আমা হতে তব ক্ষণিক দীপ্তি
আনে মোরে প্রাণে অসীম তৃপ্তি,
জ্বলে উঠে কব আহুতি লইয়া আজি আছে মোর যাহা-
তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, ওঁ স্বধা, ওঁ স্বাহা।

শিব-স্তোত্র

'জয় শিব, জয় শঙ্কর, জয় স্বর্গ-মোক্ষ দাতা,
জয় কৃপাময়, মৃত্যুঞ্জয়, সর্বদুঃখত্রাতা,
চির-সুন্দর, হে শুভঙ্কর, জয় হর ব্যথাহারী,
চন্দ্রশেখর, পাপ-তাপহর, জয় ভব-কাণ্ডারী!'—
এ-সব মন্ত্রে জাগে না হৃদয় লাগে যেন পরিহাস ;
ব্যথার দেবতা, কহ গো গোপন বেদনার ইতিহাস।
ভালে ছিল লিখা সুধাকর-টীকা, ফলে মিলে কালকূট।
তরুণ ললাট ঘেরি বাঁধা কেন দুঃখের জটাজুট?
সে জটার বাঁধে কুলুকুলু নাদে কাঁদে চির-ক্রন্দন,
চাপা বেদনার হাসি কাঁপে মুখে, ব্যথাতুর ত্রিনয়ন।
নবনী-নিন্দী সুন্দর তনু—কামেরও কামনা-ঠাঁই,
কত অভিমানে লেপিলে কে জনে অজানা চিতার ছাই!
কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া পরেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া,—না জানি সে কত জ্বালা!
বেছে-বেছে তুলে ধুতুরার ফুলে ভরা বসন্ত-রাতে,
কি জানি কি মনে ভ্রম' হে কিশোর ভূত-ভুজঙ্গ সাথে!
সুরের জনম যার কণ্ঠে, সে বেণু-বীণা তেয়াগিয়া
সাধারণ দুখে কাটায় কি দিন শিঙা-ডুগ্‌ডুগি নিয়া?
কি জ্বালা ভুলিতে, জ্ঞানের আকর, ধরেছ ভাঙের নেশা?
অন্নপূর্ণা-পতি কম দুখে ভিক্ষা করেনি পেশা
কহ কহ দিগ্‌বাস!
পূজার অর্ঘ্যে চাপা-পড়া যত বেদনার ইতিহাস।

সুখের দেবতা মরে যুগে-যুগে, তুমি চির-দুখময়,
সুখ বাঁচে-মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি,
মাঝে-মাঝে বুঝি ববম্‌-ববম্‌ জেগে উঠে বিদ্রোহী।

পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন।
তোমার ব্যথার ম্লান সায়াহ্নে মিলায় দীনের দিন।
তবু শেষ হবে খেলা,
—এই চির-অবহেলা—
প্রলয়-সন্ধ্যাবেলা
যবে— দুঃখ-সিন্ধু ছাপায়ে উঠিবে তোমারও ধৈর্য-বেলা।
তখন জাগিবে রাঙা কল্লোল ভীষণ বিষাণ রবে,
লণ্ড-ভণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড হবে শিব-তাণ্ডবে।
সহস্র-ফণ অনন্ত ফণী আস্ফালি লাঙ্গুল
তোমার নৃত্য-ঘূর্ণাবর্তে হবে বিচূর্ণ ধুল।
পলকে জ্বলিয়া লেলিহ শিখায় লক্ষ সুখের বাতি
পলকে নিভিয়া আনিবে প্রলয়-চিরান্ধ-দুখ-রাতি।
জাগিবে একক বিরাট দুঃখী রাখি দুঃখের মান,
মহাশব-বুকে মহাশিব সুখে জাগাবে মহাশ্মশান।
সেদিনের আশা পরম-নিরাশে বাজা রে বগল বাজা,
—জয় শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর জয় দুঃখের রাজা!

অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
আজি ভাদ্র-অমানিশাযোগে
ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ করি দ্বার,
তোমারে করিব আবাহন,
তোমারে করিব নমস্কার।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
জ্যোতিঃরূপ এ বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ ;
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়ে সপ্তরশ্মি-রথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ।
বিচিত্র আলোকচিত্র করি একাকার
দিকে-দিকে ব্যাপিবে তোমার
সর্বগ্রাসী স্থির কৃষ্ণহাসি ;
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হতে
রক্তালোক-স্রোতে
ভরি দিয়া ব্যোম্‌
যেদিন প্রথম
জন্মমাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্‌ ওম্‌ ওম্‌ ;—
তুমি মাতা মূর্চ্ছাগতা কে করে সান্ত্বন?
অদ্যাবধি তাই,
বিশ্ব হায়
কেঁদে-কেঁদে ফিরে নিঃসহায় ;
কেঁদে ফিরি আমরা সবাই।

সম্মুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,
পিছনে ছায়ায়,
অনন্তব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই।
জনম-ক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে-যুগে জীবে-জীবে হল চিরন্তন।
দিশাহারা বিদেশি সবাই,
কেহ নাই,
ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম,
যত কাঁদি ততো জপি আদি আলোকের
ক্রন্দনের বীজ—ওম্‌ ওম্‌ ওম্‌।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
আঁখির এ ক্ষুদ্র তরণীতে যে হয়েছে পার
আলো-পারাবার,
শুধু তার কাছে ধরা দেছে তব অপরূপ
কালোরূপ।
সে দেখেছে,—
আলোরূপী শিবে করি শব চরণে চাপিয়া
কালরূপী মহাকালী নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।
আঁখি মুদে
সে বলেছে কেঁদে,—
'তিমিরে তিমিরহরা সর্বনাশী তুমি মা আমার ;'
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!

তাহার শ্রবণে
জীবনের বাদল পবনে
কেবলই পশিছে আসি
তমঃপুঞ্জ তমালের কুঞ্জ হতে
তোমারই সুদূর সেই আহ্বানের বাঁশি
ঘনঘোর ভাদরের রাতে
সুরের পশ্চাতে
তোমারই গহনে এসে
পেয়েছে সে
নবঘন-শ্যাম শ্যামে তার।
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
বন্ধ ঘরে মুক্ত করি দ্বার,
আজি এ অনিদ্র আঁখি-তারা
হেরিছে অগণ্য তারা তোমার মাঝার।
ওরা নাকি নহে ক্ষুদ্র সব সুবৃহৎ,
তেজে ও বিদ্যুতে ভরা জনে-জনে বিশাল জগৎ?
এত শক্তি, এত তেজ-আলো,
না জানি তাহারা
তোমার সাহারা-গায় বিন্দু-বিন্দু বারি-প্রায়
কোথায় মিলালো?
শত সূর্য নাকি
তব মহারণ্যপুরে
দূরে-দূরে হয়েছে জোনাকি?
তাই ভাবি আমি,—
আলোরে করেছে ক্ষুদ্র আলোকের স্বামী ;
তোমা-'পরে তাঁর
নাই—কোন অধিকার!
আঁখি-তারা হতে
গগন-তারার পথে-পথে
নিত্য-অনুভূত তব প্রসারিত বিরাট বিস্তার!
নিদ্রিত-জননী-বক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে লয়ে কণ্ঠহার ;—
কোন্ মহাশিশু ক্রীড়াসুখে,
তব বুকে

ঘুইরাইছে জ্যোতির্মালা বিশ্বশৃঙ্খলার।
অন্ধকার, মহা-অন্ধকার!

অন্ধকার, মোর অন্ধকার!
অসীম মানসাকাশে মম
জনম-জনম
কোটি-কোটি বৃহৎ জ্বালার
জ্বলে যে নক্ষত্ররাজি, ক্ষুদ্র হয়ে বিস্মৃতিব পার,
তারি'পরে তব
দাও টানি কৃষ্ণ যবনিকা।
লভুক নির্বাণ শেষ রশ্মি-শিখা।
দাও সমাপন-শান্তি, দাও সুপ্তি মহাসান্ত্বনার।
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধহীন
রসেভরা তোমার পাথারে
হউক বিলীন
সত্তা মোর, মোর অহঙ্কার।
অন্ধকার, চির-অন্ধকার।

লোহার ব্যথা

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিকো কর্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধরেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হল,
ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোল গো যন্ত্র তোল!
ঠকা-ঠাই-ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল্‌গোছে ছেনি চুমে।
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়,, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি ;
ক্লান্ত নিখিল, কর গো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।

রাত্রি দু'পরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে-গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা করে ;
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম,
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
ধড় হতে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।

ঘন ঘন ঘন পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি,
স্থির হয়ে যাই ভাবিবারে চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।

আগুনের তাপে সাঁড়াশির চাপে আমি চির-নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হয়ে সহি শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিন-রাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরি নেহাই-হাতুড়ি ভাই হয়ে ভাই-এ পেটে!

ও ভাই কর্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার,—
কহ গো বন্ধু কহ কানে-কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হত তাহে ক্ষতি?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি!
কি কহিছ ভাই, আমি হব তুমি এই প্রেম সহি যদি?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি।

ভক্তির ভারে

বন্ধু,

বহুকাল পরে এসেছি দুয়ারে পরমভক্তবৎ
ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী আর নাকে-কানে দিই খৎ।
ফোঁটা-মালা-শিখা ত্রিপুণ্ড-রেখা মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ,
তুলসীর ফুল, কুশ-কাশমূল, এরা দিবে তার সাক্ষ্য।
তোমার নিন্দা করিয়া যেদিন মুখে উঠে তাজা রক্ত,-
শপথ করিয়া সেদিন বন্ধু হয়েছি তোমার ভক্ত।
সিঁদুরমাখানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধরে সাধি শীতলার গাধী বিরূপাক্ষের ষাঁড়।
প্রাণপণে অবিরাম
জপি,—হনুমান, মুশকিল আসান, শিব-শনি-কালী-রাম।

মিটায়েছ তার সাধ—
জলে বাস করে যে মূঢ় করিল কুমিরের সাথে বাদ।
তোমার উপরে সিধে সত্যেরে গর্বে যে দিল ঠাঁই,
ভিতরের যত চাপা পচা ক্ষত বাহিরে দেখাল তাই।
সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যে-জনা দেখিল নাড়ি,
হাটের মাঝারে স্পর্ধা করিয়া যে-জনা ভাঙিল হাঁড়ি,
তোমার বিধান,—অঙ্কুশ-'পরে হানি ঘন অঙ্কুশ
মত্তহস্তীসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।
আজি দুর্বল-অক্ষম আমি ভয়-সংশয়-যুত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু? হল কি মনঃপুত?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের 'পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধরে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ!

নব-নব তব অত্যাচারের মানিনিকো বে-আইন,
বাহির হইতে অন্তরে তাই করেছ অন্তরীণ।
বাহিরের হাসি বাহিরের আলো চলে বিপরীত-মুখে,
ভুলেও দ্যায় না সান্ত্বনাকণা থ্যাঁৎলানো এই বুকে।
নিবাইলে সব আলো,
নির্জন পুরী, অন্তর ভরি কল্লোলি আসে কালো।
শ্মশানের খাটে বাঁধা কাটে চির-অনিদ্র আঁধারাত,
আচমকা পিঠে সুড়সুড়ি দ্যায় মৃত্যুর হিম হাত।
মনে-মনে যদি দৃঢ় করে বাঁধি মনটারে যথাসাধ্য,
বেজে উঠে ঘন ভরিয়া শ্রবণ বক্ষে বলির বাদ্য।
আঁধারের স্রোতে ফেনার মতন থেকে-থেকে আসে ভাসি
বিদ্রূপভরা সুহৃদ-কণ্ঠে ওপারের কালো হাসি।
তবু মাঝে-মাঝে হাসি পায় তব হেরিয়া রসজ্ঞান,
'ঘুমিওপ্যাথি'র আবিষ্কর্তা!—অনিদ্রা-ম্রিয়মাণ!
চার হাত খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিন হাত ঘরে
কৌতুক দেখ কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে-ঠুকে মরে।
প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ—যে-জন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়াভাঙা যত কোলকুঁজো ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি করপুট,—
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়া উট।
আমি তাই হতে চাই,—
তব নিদারুণ প্রেমিক, বারেক নিষ্কৃতি যদি পাই।
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণামে হইব অষ্টাবক্র,
বুকের দুগ্ধপিয়াসা মিটাবে তোমার চরণ-তক্র!

ভক্ত হবার সকল রকম সাধিতেছি কস্‌রৎ,
দোহাই বন্ধু, আঘাতের ফাঁকে দাও কিছু ফুর্‌সৎ।
অসহ্য এই নিজ অন্তরে নিজের নির্বাসন,
ঘুমের আশায় অসীম রাত্রি একাকী এ জাগরণ!
অসহ্য এই বিস্মৃতি-আশে নিয়ত স্মৃতির জ্বালা,—
বুকের উপর হারানো মুখের জপের মুণ্ডমালা।

দুখবাদী

তারই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তারই পরে তব কোপ,
যে-জন কিছুতে গিলিয়ে চায় না এই প্রকৃতির টোপ
সুনিল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে-গাছে ফুল, ফুলে-ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।
ছবিও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি-সিন্ধু-সাহারা-গোবি।
তেলে-সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয় ;
সুখ-দুন্দভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
অতল দুঃখ-সিন্ধু
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু!
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে বসে গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বড় মান
দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
বজ্রে যে-জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভায় তারিফ সে বংশে কেবা করে?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে!
ফাল্গুনে হেরি নবকিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে-শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী!

এই বিশ্বের ব্যবসায় লাভ বন্ধু তুমি তো জান,
একা বসে যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো।

জমাখরচের কৈফৎ কেটে বাকি যে ফাজিল কত,
বাহিরে 'বিজ্ঞাপনের' যাই বল,— অন্তরে বুঝেছ তো!
বজায় থাকিতে খ্যাতি,—
সহসা জ্বালাবে কোন্ সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি।
সুখে মোড়ো দুখে ভরা কতবড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।
সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো বলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি-দিবা।
চটক বা চখা কি জানে প্রেমের? বকে কি শিখাবে ধর্ম?
সহজ-স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবনমর্ম!
অরণ্যতরু জপিয়ে অন্ধঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়ত কি আরাম!
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা—
রাঙা সন্ধ্যায় বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা!
খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়ঋতু-ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য।
ছলে-বলে-কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া তো চমৎকার!

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে-মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে-কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হতে চুরি।
সৃষ্টির সুখে মহাখুশি যারা, তারা নর নহে জড়,
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।

সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরান যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সখ-দুখ-দান ফিরাযে দিলেও চলে।

কবির কাব্য

সন্দেহ হয় পেয়েছ বন্ধু, কবির কু-অভ্যাস,—
যত দুখ পাও মিঠে সুরে গাও দুঃখেরি ইতিহাস ;
কবির সে দুখগান,
শুনি দুটি কানে যিনি প্রাণে-প্রাণে যত বেশি সুখ পান,
তিনি ততো অনুরক্ত রসিক ভক্ত সমজ্‌দার।
কবির বুকের দুখের কাব্য ভক্তে চমৎকার।
মেঘে-মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন,—বনে-বন শিখী নাচে ;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।

জ্বালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে।
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে,
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তবগুঞ্জন তুলে।
মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি ধরিতে চায়।
যত বেলা উঠে তপনের ফুটে বহিরন্তরদাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাই।
দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী-গান ;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
সেই রাত্রির তারায়-তারায় জ্বলে অসংখ্য জ্বালা,
আঁধাব আঁচলে নিশার অশ্রু উষার শিশির-মালা।

এমনি বন্ধু ভুবনে-ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর-তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি
প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা?
তথাপি বন্ধু নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে-ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয়-রক্ত মাখা!
চোখে-চোখে ঝরে কার যে অশ্রু বুঝেও বুঝিনে কেউ,
বুকে-বুকে ভাঙে কোন্ সে অতল বুকের দুখের ঢেউ?
কণ্ঠে-কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠে!
মরণে-মরণে তিল-তিল করি কোন্ মহাপ্রাণ টুটে?

আছে গো আছেও সুখ,—
খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ!
মাঝে-মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা!
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা!
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুনি
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।

দেশোদ্ধার

বার-বার তিনবার,—
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার।
শোন্‌রে শ্রমিক শোন্ ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালোবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।

তোদের দুঃখে হায়,—
পাষাণ হলেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
কোরোনাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়নে ঘষিনি লঙ্কা,
সত্য-সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়।

ওরে চিরপরাধীন!
তোরা না জানিস মোরা জানি তোর কি কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি পড়ে পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তের আনা প্রাণ ;
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন!

তোরাই যে ভাই দেশ,
তোদের দৈন্য-জন্য মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহার্ঘ হলে বেগুন-পালঙ্
যদিও ভিতরে চটে হই টং,
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে-মনে বুঝি বেশ।

ওরে নাবালক চাষা!
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা।
শ্রমিক-চাষীর দুঃখে ফর্দ

রচিবে ছুটিব লিলুয়া-খড়্দ।
গড়িয়া আইন ভাঙি বে-আইন জাগাইব নব আশা!

ওরে ওঠ্ ওঠ্ জেগে,—
তরুণ-অরুণ আলোকে জানা ও অজানা ব্যথায় লেগে!
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায়ে বলদের দল,
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল্ বেগে।

জুড়ে দে লাঙল কষে—
ফালের আগায় যত উঁচু-নিচু সমভূম্ কর চষে।
মাথা উঁচু করে আছে ঢ্যালাগুলো,
মই-এর চাপনে করে দেরে ধুলো ;
কাঁটার বংশ কররে ধ্বংস জো-এ জো-এ বিদে ঘষে।

ফসল হবেই হবে।
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস যাকে,
টেনে তুলে বলে রুয়ে দিবি পাঁকে ;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে-ঝড়ে-জলে-বজ্রে-বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
সরে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা!
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিস্টার!

শরতে বঙ্গভূমি

আজি কি তোমার বিধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা-ডোবাতে।
পারে না বহিতে লোকে জ্বর-ভার,
পেটে-পেটে পিলে ধরেনাকো আর ;

দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎ কালের প্রভাতে।

জননী, তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
রোগে বন্যায় 'ভাগে ভবানী',
তোমার ভবনে-ভবনে!
অবসর আর নাহিকো তোমার
দলে-দলে ছুটে ভলন্‌টিয়ার,
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত,—আনিতে লবণে।
জননী, তোমার চির-চাঁদা-খাতা
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে!

গুলি কাদাপাঁক করেছ বেবাক্
জলাশয় ঘোলা-বরণী।
পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা,
বন-জঙ্গলা ধরণী।
ঘরে-দ্বারে আর ঝোপে-ঝাড়ে বনে
বাঁশি বাজে যেন সকরুণ স্বনে,
ওড়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে ঢোকে মুখে-নাকে
মশক মশক-ঘরনী।
জলাশয়গুলো করিয়াছ ঘোলা
বন-জঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে ;
কুটিরে কুটিরে নব-নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে
দিকে দিকে মাতা উঠে ক্রন্দন,
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন,
যমদূতচয় মুঠা মুঠা লয়—
পড়ে-পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে।
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে।

আয় আয় আয় যে আছ যেথায়—
কাঙালি ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার খুদ বাঁটিছে জননী
বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।
ওঘর হইতে আয় হামা দিয়ে,
ওবাড়ি হইতে আয় খোঁড়াইয়ে,
কে কাঁদি ক্ষুধায় মায়েরে কাঁদায়,
খুদ-কুঁড়া খায় খুঁটিয়া?
ভিক্ষা-অন্ন বাঁটিছে জননী,
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে কণ্টক-মালা,
ব্যথায় কাঁদিছে ডুকরি,
তালি-মারা মেঘে আকাশ-আঁচল
ছিন্ন যেন সে ধুকরি।
কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হিরণে,
কঠিন শিকল-বিকল চরণে
জননী কাঁদিছে ফুকরি।
রোগে-বন্ধনে-তাপে ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি!

গঙ্গাস্তোত্র

চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে।
কুলুকুলু কলকল প্রবাহিত আঁখি-জল
দেব-মানবের একসঙ্গে।
বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হল না ঠাঁই, শিবজটা বাহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।
হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী ;
যুগে-যুগে নরনারী-অফুরান্-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

তব তীর-ধীর-বায়ু হরিল কত না আয়ু,
কত আলো স্রোতোজলে মিলালো!
ভরি তব ভাঙা পাড় কত কোটি হাহাকার
ভাঙা বুক রাঙা আঁখি ঘুমালো!
ভরা কোল করি খালি জননীরা আনে ডালি
যুগে-যুগে মাগো তোরি অঙ্কে,—
কত না বালুর চর সে ব্যথায় উর্বর
বলি-অঙ্কিত তট-পঙ্কে!
অশ্রুপূত ও জল, পূত তব তটতল
লুপ্ত করিয়া কত কীর্তি ;
কত না চিতার ছাই মিশাইয়ে আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মৃত্তি।
তাই আনি কত মাটি গড়ি নিজ দেবতাটি
তোমারি সলিলে যবে পূজি মা!
যুগে-যুগে যত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না।
তাই গাহি তব তীরে, তাই নাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে মা!
কলোকল্ কুলুকুল্ এ ধারার কোথা মূল
কোথা কূল দিস্ যদি বলে মা!
বন্দি ত্রিকালজয়ী গঙ্গে মূর্তিময়ী—
অনন্ত-জীব-ব্যথা-প্রবাহ!
অনাদি ও ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন-এ,
বুঝেনে মা এ প্রাণের কি দাহ!

মৎস্য-শিকার

ওগো মেছুরিয়া ভাই!
ক্ষণেক দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে মৎস্য-শিকারে যাই।
ঘুমিয়ে ও জেগে, জেগে ও ঘুমিয়ে রাত যদি কেটে যায়,
দীর্ঘ অলস বর্ষাদিবস কাটিবারে নাহি চায়।
কর্মবিহীন কাটাইলে দিন ধর্মনাশের ডর ;
তোমার সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া ছাড়া নাহি গত্যন্তর।
ছিপ-সুতো-টোপ-ফাতনা-বঁড়শি হরেক-গন্ধী চার!—
এ অর্বাচীন তোমারি উপর দিতেছে সে সব ভার।
প্রতিদিন প্রাতে একা যাও ভাই আমার দুয়ার দিয়া,
আজিকে বন্ধু চলগো শিকারে আমারে সঙ্গে নিয়া।

সেদিন দু'পরে মাচার উপরে,—সে তো বসেছিলে তুমি?
মেঘ-ভাঙা রোদে বিলের শেহালা গুমটে উঠিছে গুমি।
উড়ে মাছরাঙা, দূরে তীরস্থ জীর্ণ অশথশাখে
সন্ধানশীল শকুনি ও চিল কেঁদে উঠে থাকে থাকে।
চাহি আনমনে জলছবি-পানে কাটিছে তোমার দিন,
ফাতনার সনে ক্ষণে-ক্ষণে আঁখি একাগ্র, উদাসীন।
সবভোলা কোন্ স্বপনের মাঝে, ফাতার চকিত নৃত্যে
চমকি জাগিয়া চেপে ধরো ছিপ আশা-উন্মুখ চিত্তে।
টোপ খেয়ে কভু পলায় শিকার, কখনো বঁড়শি গিলে,—
চক্রচ্যুত দ্রুত চলে সুতো, কভু নিষ্ফল ঢিলে!
মেছুরিয়া উদাসীন!
পাও নাই-পাও, আসো আর যাও, তীরে বসে কাটে দিন।

নদী-খাল-বিলে, দীর্ঘিকা-ঝিলে, সব ঠাঁই ধরো মাছ,
চুনো-পুঁটি-রুই-মৃগেল কিছুই নেইকো তোমার বাছ।
কাল বৈকালে রাজ্‌ড়ার খালে, 'লোভা'য় ধরিলে শোল,
পরশু প্রভাতে ক্ষেমির ডোবাতে পুঁটিতে ভরিলে খোল।

কত মতলব, নব-নব টোপ, নিত্য নূতন চার,—
ঘ্যাচ্‌রা-আন্‌কা ভাসা-ডুবো কারো নেই তাহে নিস্তার।
মেছুরিয়া নিরদয়,—
জলের মৎস্য ডাঙায় তুলিতে কি হর্ষবিস্ময়!
নদীর ও কূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,—
তখনো বন্ধু, ছিপটি তোমার সম্মুখে থাকে ফেলা।
চিক্কণ কালো জলে,
মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণসর্পের মতো চলে।
দূর-পল্লীতে বেজে যায় শাঁখ, জ্বলি উঠে দীপশিখা,
থামে ছায়ানট, ঢাকি দিকপট নামে মায়া-যবনিকা।
তখনো কিসের আশে,
তোমার নয়নে ঢেউ-এর মাথায় ফাতনার ছায়া ভাসে?
গভীর আঁধার জলতলে কোথা ঘুমায় মাছের ঝাঁক,
বর্ষারাতেও তার মাঝে বুঝি পড়েছে কাহার ডাক!
নূতন চারের উতল গন্ধ আকুল করিল কারে?
বহু সন্ধানে পরমানন্দে তোমার ফাতনা নাড়ে।
টানিতে তোমার ডোর,—
বঁড়শির 'কালা' বিঁধিল কপালে, কি তার কপালজোর!
'আপাল' কাটিয়া ঝাঁপায়-লাফায়, ছিপের সঙ্গে খেলে,
তোমার লীলায় অকূল তাহারে কূলপানে ক্রমে ঠ্যালে!

মেছুরি মেছুরিয়া!
কাটে যদি রাত কাটে না তো দিন, চল ভাই সাথে নিয়া।
মিথ্যা বন্ধু লিখিব পড়িব, শেষটা মরিব দুখে,
তোমার মতন মৎস্য ধরিব,—খাইব পরম সুখে।

নবান্ন

এসেছ বন্ধু? তোমার কথাই জাগছিল তাই প্রাণে,—
কাল রাতে মোর মই পড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রানে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায়-পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।
লোপিয়া আঙিনা দ্যায় আলপনা ভরা মরাই-এর পাশে ;
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যজি এবার নিবসে চাষে।

এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পড়ে মই!
দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসো,—সে দুখের কথা কই।

বোশেখ, জ্যষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন,—
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল করে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা।
কার্তিকে দেখি চারিদিকে,—একি! এবার তো নহে ফাঁকি!
পাঁচরঙা ধানে ছক-কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।

আঘ্রানে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি—ফসলটা নাবী, আরও কটা দিন যাক,
ভরা অঘ্রানে ঘটেনা-তো কোনো দৈব-দুর্বিপাক।
মরাই-সারাই শেষ করে, সবে খামারে দিইছি হাত,
কালকে হঠাৎ—
বন্ধু, দোহাই, তুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্‌ভ—
ক্ষমা করো সখা,—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূর-দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জড়ির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস-মরালশ্রেণী,
যেথা দিকবালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল-বেণী।
উঠো না বন্ধু, অঘ্রান মাস,—তাহে নবান্ন ভাই,
অজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।
বারবেলাটুকু কাটুক দেবতা, ঘুরে আসি ক্ষেতখানা,
মইডলা ভুঁই ঘেঁটে খুঁটে আনি যা পাই ধানের দানা।
চিরান্নহীন নবান্নদিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুভখনে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি পরস্পরে,
চরম প্রণাম করিব যখন,—বন্ধু, মাথার কিরে—
ফণায়িত করে আশিস ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে।

দুঃখের পার

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপর্ঝরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরন ;

দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচির ছেলের শব পচে অকারণ!
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ?

বিধবা ভিখারি পাঁচি, একটি ছেলে,—
তার ভালে জুটিল না ঢোঁড়া কি হেলে
খাঁটি বামুনেরই শাপ,
কাটিল কেউটে সাপ,
যেদিন ছদিন পরে পথ্য পেলে,
ঢলে প'ল মা'র কোলে মায়ের ছেলে।

পথ্য পায়নি, আজ পথ্য পেতো
কেউটের বিষে যদি বেঁচে সে যেতো।
ছাইকুড়ে মান-তলে
দীনের ফসল ফলে,
তাই তুলে চালে জলে সিজায়ে খেতো,
পাঁচি যদি শুখা কাঠ কুড়াতে পেতো।

শুখা কাঠও পেয়েছিল এই বাদলে,
তাই হয়,—যার যবে বরাত খোলে।
আনন্দে ভুখা ছেলে
ছেঁড়া কাথা টেনে ফেলে
ছাইকুড়ে মান খুঁড়ে যেমনি তোলে,
'মাগো!' বলে ছুটে এসে পড়িল টলে!

চেপে নাম বারিধারা উপর্ঝরণ,
পাঁচির চ্যাঁচানি আদি হল অকারণ।
স্থির হয়ে অবশেষে
ব্যাপারটা বুঝেছে সে,
তবু বেহুলার কথা হইল স্মরণ।
বিধবা মায়ে কি মানে ছেলের মরণ?

মরা-ছেলে-কোলে পাঁচি ঘরে একেলা
অকূলে ভাসিয়ে দিল কলার ভেলা!
বাদলায় বাদলায়
দিন যায় রাত যায়,
মরণ-বিজয়ী প্রেম খেলিছে খেলা ;
মেঘ-আড়ে ফাঁকি দ্যায় শ্রাবণ-বেলা।

যে-দুখ ঘুরিয়া মরে দেহের পাকে,
পৌঁছেনা আত্মার উপর-থাকে—
সে-দুখের পারাবার
পাঁচি কি হয়েছে পার?
যে-পারে বসিয়া কবি এ ছবি আঁকে,
সেথা সে পৌঁছেছে কি? শুধাই কাকে?

ফেমিন্-রিলিফ্

আয় আয় আয় রে!
বেলা বয়ে যায় রে!
দারুণ আকালে হায়, বিধাতার করুণায়,—
রিলিফ্ নেমেছে ভাই গ্রামের সীমায় রে!
বেঁধে নে বেঁধে নে শিরে—
পাক-দেওয়া ছেঁড়া বিড়ে,
কাঁধে তুলে নে রে ভাই কোদাল ও চুবড়ি ;—
দেখো দেখো মতি মিঞা পড়োনাকো থুবড়ি!
ওদিকে হতেছে বাঁধা বসোয়ার বোরো-বিল,
এদিকে হতেছে খোদা শুকনো সাগর-ঝিল।
তিন আনা চৌকা,—
ভুখা পেটে খেটে খা,
দলে-দলে লেগে যা,—
কে বলে কঠিন মাটি? না পোষায় ভেগে যা।
ঘরে বসে মড়কে
চলেছিলি নরকে,
না হয় কোদাল হাতে মরবি এ সড়কে।
খাট্ তবে খাট্ রে!
ডোঙা পেট কোঙা কোরে গোঙা মাটি কাট্ রে!

যা বলি তা বলি ভাই, মাটিটে কি রুগ্‌ণ!
মাংসের লেশ নাই, হাড়গোড় শুকনো।
ঝাঁ-ঝাঁ করে দিক রে!
রোদে ফাটে টিক্‌রে,
ঠনকি টন্‌কো মাটি কোপ উঠে ঠিকরে।
হাত্তোর ভগবান!

দিলি কি কঠিন প্রাণ,
কাঁকুরে এ কড়া ঢ্যালা তারও চেয়ে কড়া জান!
ঠিক রোদে খাটি রে,
কত মাটি কাটি রে,
না জানি সে কত বড় যারে দেবো মাটি রে!
—এই—থুড়ি, চোপ চোপ!
হেঁই মারো মারো কোপ ;
কারো 'পরে নেই কোপ,
শুধু কোদালের কোপ!
আয় দাদা আগিয়ে,
ঝুড়ি ধর বাগিয়ে,
তাতাপোড়া দেহখানা দিসনেকো রাগিয়ে।
জোয়ান রে হেঁইয়া!
ভ্যালা মোর ভেইয়া!
আমি কাটি কপাকপ,
তুই তোল্ টপাটপ,
মেলে দুটো পাঁজরা,—
খাঁজ কাটা ঝাঁঝরা—
মাজাদোলা ছুট্‌পায়ে ফেলে আয় ঝপাঝপ।
পিল পিল পায় পায়,
পিঁপড়ের সার যায়,—
দীর্ঘ দিঘির গায়,
হায় হায় হায় রে!
মেটে কুলি যায় রে!
পেটের কি দায় রে!
তবু তো পেটের ঋণ
জমে যায় দিন-দিন,—
বে'নুন রেঙুন-খুদে
সুদ শুধু যাই শুধে,
প্রাণটাকে যত কষি, ধড় করে ঝিন-ঝিন!

ওকি, ওরে মেষ্টা!
পেল বুঝি তেষ্টা?
তোদের কষ্ট মেটে তারই তো এ চেষ্টা।
এবারের বৈশাখ
পিপাসাটা চেপে রাখ ;

প্রাণপণ কুঁদ্‌লে
এ দিঘিটা খুদ্‌লে
নাগাৎ শ্রাবণ ভাই,
জলের কি ভাবনাই?
যত জলকষ্ট
একেবারে নষ্ট ;
তুই যদি না থাকিস—তোরই সে অদৃষ্ট!
দফাদার মামা গো!
মাটি না এ ঝামা গো?
যাই হোক রফামত তোর মুখ থামাবো।
সবই জানো বাপধন! খেটে সারাদিনটে,
রোজগার দু-আনার, খেতে পেট তিনটে।
তারও এক আধ্‌লা!...
দাঁড়িয়ে যে বাদ্‌লা?
ছেলেটা? বালাই গেছে, তুই ভাই কোদ্‌লা।
এই ছোঁড়া সুখলাল!
কোন্ দুখে মুখ লাল?
মোড়লের পো বলে কি কম করে দেবে গাল?
ওই মোলো ছুঁড়িটা,—
ছুঁড়িটা না বুড়িটা?—
নাহক্ ছুঁটে পড়ে ভাঙে নয়া ঝুড়িটা।
কি কর রহিম চাচা এই বুড়ো বয়সে!
লুকিয়ে চৌকো চাঁচা! ধর্মে কি সয় সে?
আচ্ছা, বলত চাচা, এত যারে ডাকলে—
সে বিধি মেহেরবান
হিঁদু না মোছলমান?
পোড়াব না গোর দেবো দেহখানি রাখলে?
দূর হোক—মাটি কাটো, কেবা জানে কিসে কি,-
যতই ঘুলিয়ে দাও, তেলে-জলে মিশে কি?
খেতে পাও নাই পাও শুধু চল কুপিয়ে,
বুড়ি বেটি মাটিটাকে আগাগোড়া চুপিয়ে,
মায়াবিনী শয়তানী চির বহুরূপী এ!
কার ধন দ্যায় হরি' কারে চুপি-চুপি এ!
মারো এরে কুপিয়ে!—
বুকে বুঝি মুখ বয়ে খুন ঝরে টুপিয়ে!
চল্ চল্ কুপিয়ে!

কেবা শোনে কার কথা? কাঁদিসনে ফুঁপিয়ে ;
কোপের উপর কোপ ফ্যাল্ ঝুপ্‌ঝুপিয়ে ;
কোদালের মুখ হতে নে-রে চাপ লুফিয়ে,
চল মাটি কুপিয়ে ;—
চৌকার চারকোণ ঠিক মাপ-জুপিয়ে।
খুন ঝরে টুপিয়ে রে, জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
ওই দ্যাখ্ চৌকোর চারদিকে গল্‌দি।
আমার চৌকো মেপে পাবে কেউ ফাঁক কি?
বুকে তার সাক্ষাৎ শিবরূপী সাক্ষী।
হেঁই চল কুপিয়ে,
শক্ত বেহায়া মাটি রক্তেতে ছুপিয়ে।
খাল ধরে বুকে রে!
খুন ঝরে মুখে রে!
মাটির কঠিন টানে শির পড়ে ঝুঁকে রে!
ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্—জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
কড়া রোদে খামকা কে গুলে দিল হল্‌দি?
ডুবলো কি চাকি ওই?
পুবকোণে দু-কোদাল এখনো যে বাকি ওই।
কোদাল কি হাতে নেই? নেই কুছ্‌পরোয়া,
মাটিটুকু দাঁতে কাটি এ মোদের ঘরোয়া।
নখে-দাঁতে মাটি কাটি, ভরে নেই আঁজ্‌লো ;
মাটিকাটা প্রাণ আজ মাটি পেয়ে বাঁচলো!
কাঁদিসনে খোকাধন, ভাবিসনে বৌ গো!
আজ তো কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো।
বুকে-পিঠে মাটি চাপে! এ মাটি কে মাপে রে?
হক্ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে!
মাপদার! মাপ দাও ও হাতেরি মাপা ওই
নয়নজলের আমি নিমকহারাম নই!

শরশয্যায় ভীষ্ম

কুরুক্ষেত্রে চিরস্তব্ধ ভীষণ সময়-মন্দ্র ;
অন্তিম নতি লহ ভীষ্মের অস্তোন্মুখ চন্দ্র!
বংশের মোর হে আদি-দেবতা! দাঁড়াও আঁখির আগে,
মরণ-পন্থে সন্তান তব শেষ স্নেহাশিস মাগে।

তুমি জানো দেব, কোন্ গূঢ় খেদে শরের শয্যা পাতি
শিশুর মতন কাটায় ভীষ্ম দিবসের পর রাতি।
কেন একা অনাদৃত
আপনবংশ-ধ্বংসের মাঝে পড়িয়া জীবন্মৃত!
দেবব্রতের নিজ পৌরুষে অর্জিত অমরতা
হেলায় ফেলিয়া কেন চলে যাই,—তুমি জানো সব কথা।
একে একে যবে সাত ভাই ডোবে জননীর স্নেহ-নীরে,
লীলাকৃতার্থ স্বর্গের মাতা স্বর্গে গেলেন ফিরে!
বিস্মৃতি-তলে মা'র মুখখানি আজও খুঁজি, হায় মোহ!
দেবী হয়ে নরে গর্ভে ধরিল,—এই তো অনুগ্রহ।
সেই জাহ্নবী মিটালেন যাঁর যুব-চিত্তের ক্ষোভ,
পরিণামে হায় জন্মিল তাঁর ধীবর-সুতায় লোভ!
বৃদ্ধ পিতার সে মত্ততার প্রায়শ্চিত্ত-আশে,
নবযৌবনে কামনানাগিনী বাঁধিনু সত্য-পাশে।
রাজ্যের লোভে বংশে যাহাতে না ঘটে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব,
পণ করেছিনু—তুমিও তাহাতে সাক্ষী ছিলে তো চন্দ্র!
আজি শরশয্যায়
মূঢ় কিশোরের সে দৃঢ় দুরাশা মনে পড়ে হাসি পায়!
কৌরবকুল-গৌরব ভাবি বিমাতার সুতে পালি,
তুমি জানো দেব, কি অগৌরবে একে একে দিনু ডালি।
'চন্দ্রবংশ নির্মূল হয়',—বিমাতা সাধিয়া কহে :—
ইঙ্গিত বুঝি কহিনু,—'জননী, সে তো আমা হতে নহে।'
বিস্ময়ে শুনি,—ব্যাসমুনি মোর ঋষিজ্ঞ কানীন ভাই!
—যত তেজই হায় থাক্ অনলের পোড়াতে পারে না ছাই।
খর দিবালোকে মিটে নদী-বুকে মুনির মনের আশ,
ধরণী সে লাজে আজও মাঝে-মাঝে টানে কুজ্ঝটি-বাস।
শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সম্মতি দিনু, সহজ বুদ্ধি ঠেলে,—
আমার বংশে জন্মিল এসে অন্ধ পাণ্ডু ছেলে!
শোন দেব, মোর শরের শয্যা নহে নহে অকারণ,
কুলবধূ নিয়ে সেই কদাচার, আজিও পোড়ায় মন!
অধর্ম হত! না হয় সেদিনই লোপ হত কুরুকুল ;
সাথে-সাথে যত ভারত-ক্ষত্র হত না তো নির্মূল।

জ্যেষ্ঠ রহিল বন্ধ করিয়া আপন অন্ধ কারা,
যৌবনযোগে পাইল পাণ্ডু পিতৃব্যের ধারা।
হীনবীর্য সে বসিয়া দেখিল বংশের অপমান,—

দেবতা আসিয়া যুবতী জায়ারে করিছে পুত্রদান।
ছিল বটে প্রথা পিতামহদের আনে ত্রিদিবের মেয়ে,
চতুর দেবতা প্রতিশোধ তাই দিল কি সুযোগ পেয়ে?
দেব-কৃপালোভী তপঃসিদ্ধ মূর্খ মুনির বরে
ধর্ম আসিয়া অধর্ম করে মূঢ় মানবের ঘরে।
ক্ষত্রিয় যুবা মরে ক্লীবহেন বনে রমণীর বুকে!
পঞ্চপুত্র সাথে লয়ে রানী ফিরে এল অধোমুখে।
পাঁচজনে কহে পাণ্ডুসুতের পঞ্চ দেবতা পিতা।
রোমে-রোমে মোর শরের বেদন,— আজও তবু ভুলিনি তা।

দ্বন্দ্ব বাধালো অন্ধের ছেলে দম্ভী দুর্যোধন ;—
মরণ-তোরণে কেমনে কহি তা একান্ত অকারণ?
দুখ মোর এই—ক্ষত্রিয় হয়ে আশ্রয় করে ছল ;
মুগ্ধ আমারে করেছিল বটে পাণ্ডব-বাহুবল।
আজিও ভুলিনি—পাঞ্চাল-ভূমে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে
একক যুবক অযুত রাজায় বিমুখ করিছে শরে!
সে কি আনন্দ!—প্রভাতে যখন শুনিনু পার্থ সেই।
সে যে কি লজ্জা!—দূতমুখে যবে শুনিনু পরক্ষণেই—
মাতার আদেশ পেয়ে
পাঁচ ভাই ভাগে বিবাহ করেছে স্বয়ম্বরের মেয়ে।
হে কুলদেবতা! তোমার অঙ্গে কত কলঙ্ক সহে?
পঞ্চপতি কি কুলগত হল? ব্যাভিচার কারে কহে?
শুধু বংশের কল্যাণ ভাবি সে বিষও কণ্ঠে ধরি ;—
শরশয্যায় সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।
রাজ্য লইয়া কুরু-পাণ্ডবে আবার বিবাদ বাধে ;
দম্ভে-ধর্মে পাশাখেলা চলে! নীরব রহিনু সাধে?
পাশার বাজিতে রাজ্য হারিয়া রাখিল পত্নী-পণ!
পুত্তলীপ্রায় দেখিনু যা সব করিল দুর্যোধন।
নির্বাক হয়ে ভাবিতেছিলাম ;—কোন্ লজ্জাটা ভারী?
—পাশা জিনে রাজা সভার মাঝারে উলঙ্গ করে নারী,—
না,—ব্যসনাসক্ত ধর্ম ওদিকে সত্যের অভিমানে
ক্ষত্র হইয়া দেখে,—পত্নীর কটির বসনটানে?
ভার্গবজয়ী ভীষ্ম সেদিনও আবার করিল ভুল,—
না করি অস্ত্রে কুরু-পাণ্ডব একসাথে নির্মূল।
তাই সহিলাম—ফাল্গুনি যবে প্রতি ভুল গুনে-গুনে
রোমে-রোমে বিঁধে দিল অপূর্ব সরে বর্ম বুনে।

কুরুক্ষেত্র-অবসানে দেব, আজও কি বলিতে হবে,
কৌরব ছাড়ি কেন কুরুপতি বরে নাই পাণ্ডবে?
কি নৈরাশ্যে রণভূমে পুনঃ বাহুতে পাইনি বল?
দশদিন ধরে কেন করেছিনু শুধু যুদ্ধের ছল?
বীর্য, সত্য, মনুষ্যত্ব—সবই যদি হল ফাঁকি,—
মর্ত্যে কেবল অমরতা নিয়ে কতকাল বেঁচে থাকি?
বৃথা যৌবনে কুল-কল্যাণে ত্যজিনু রাজ্যদারা ;
মিথ্যার তরে সত্য যে করে, সে হয় সত্যহারা।
পাপকে পন্থা যে দ্যায় ছেড়ে, সে লভেনা ত্যাগের পুণ্য,
দেবী-লীলা ফোটে মানুষ যখন মনুষ্যত্ব-শূন্য ;—
শিখণ্ডীপিছে পার্থ যুঝিছে,—হাসে হরি রথোপরে,
ভাগ্যে ভীষ্ম বর পেয়েছিল ইচ্ছামাত্র মরে!
তুমি কি বোঝনি কত দুখে আর স্পর্শ করিনি ধরা?
অসহ যাতনা, তবু কেন নাই স্বর্গে যাবারও ত্বরা!
ওগো গগনের নীরব সাক্ষী! তব বংশের শেষ
দেখে যাব বলে শর-শয্যায় পড়ে আছি অনিমেষ।

আজ সপ সমাপন ;
বংশের সাথে হল নির্বাণ ভিতরে-বাহিরে রণ।
আঁধার নিশীথে তুমিও চন্দ্র চলিলে অস্তাচলে ;
ভীষণ শ্মশানে শবাসনে যত শ্বাপদের আঁখি জ্বলে!
শোণিতগন্ধী মহাপ্রান্তরে ঝিমায় অন্ধ রাতি ;
দেহ খুঁজে মিছে আত্মা ভ্রমিছে জ্বালি খদ্যোৎ-বাতি!
দিগন্তে ফুটে তোমার মৃত্যুবীভৎস মুখছবি ;—
ও কি ও! সহসা জ্বলিয়া পলকে নিবিল কি শত রবি!
ঢাকে চারিধার সচল আঁধার, কল্লোল ক্রন্দন!
প্রলয়পয়োধি ভাঙে সৃষ্টির বেলা-বালু-বন্ধন!
ওকি দেখি পুনঃ? পাণ্ডুভীষণ সে মহাপ্রলয়-বারি
বটের পাতায় পার হতে চায় নিরুপায় কাণ্ডারী!
নারায়ণ! একি দৃশ্য!
প্রলয়মাঝে কি বাঁচিল একাকী শরশয্যায় ভীষ্ম!

ক্ষমা করো মোর ক্ষণিকের ঘোর হে কুলদেবতা মম!
মরণ-আহত বিহ্বলচিত ভীষ্মের ভয় ক্ষম।
দক্ষিণপথে বিফল হইয়া কাল হতে শুনেছি গো,—
উত্তরায়ণে ছুটিবে ভ্রান্ত গগন-মরুর মৃগ।
চির-তৃষার্ত তেজ-জর্জর সেই তপনের সাথে
জীবন ছাড়িয়া মরণ-পথের পথিক হইব প্রাতে।

শেষবার মোর প্রণাম লহগো চন্দ্র অস্তগত,—
তুমি জেনে গেলে কি শর-শয়নে মরিল দেবব্রত।

পিছুহটার গান

পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই!
না হটিয়া পিছে আগে ছুটে মিছে—
ঘটায়ো না সঙ্কট ভাই!

ভবসংগ্রামে হাঙ্গাম দেখে
হটে এসে উঠে বুদ্ধ,
পিছু হটে হটে ফরাসীয় মাঠে
ফতে হল মহাযুদ্ধ।
হটিতে-হটিতে মহাত্মা গাঁধি
হাঁটুর উপরে উঠালেন খাদি,
অসাধ্য কাজও হটযোগে আজও
ঘটে যায় পটাপট ভাই।
কুরুক্ষেত্রে মেলিয়া নেত্র
হঠাৎ হটিল পার্থ,—
তাইতো কলিতে অলিতে-গলিতে
গীতোক্ত পরমার্থ।
পিছুহটনের গুহ্য সূত্র
কিছু লিখে গেল চণকপুত্র,—
শিং আছে যার যেয়োনাকো তার
দশহস্ত নিকট ভাই।

সম্মুখটানে সঙ্কটপানে,
ধু-ধু কর্মের মরুপথ ;
পিছে বাপ-দাদা করে গেছে কাদা
সেথা চেপে বসা নিরাপদ।
বিষ্ণুশর্মা কহে মারি বেত—
'গণস্যাগ্রে নহি গচ্ছেৎ' ;
গণতন্ত্রীয় এ মূলমন্ত্রে
পিছু হতে ঘাড় মটকাই।
কার ঘাড়?—...ড্যাস্ ডট্ ভাই।
পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই!

কেতকী

এ বাদলারাতে কেন গো বন্ধু আমার শয়নঘরে?
মোর মতো কি গো নিদ্ নামিলনা তোমারও নয়ন 'পরে?
বাহিরে শহরে কাঁদিছে বরষা, ভিতরে বস গো ভাই!
আবছা আঁধারে শোনাই তোমারে কেন চোখে ঘুম নাই।
শহরের মাঝে নামিল পশলা, সাঁঝে ফিরিতেছি বাসা,
দেখিতে দেখিতে রাজপথে-পথে জল জমে গেল খাসা।
বৌবাজারের মোড়ে,—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস থোড়ে,
যে চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়, পা পায় না খুঁজে পথ,
যেথা যাবতীয় রথের সারথি খারেক থামায় রথ,
যেখানে বন্ধু,—থাক বর্ণনা, আসল কথাই কহি,—
পৌঁছিয়ে সেথা সহসা কি ব্যথা উঠে যেন বুক বহি!
বাদলা-মাথায় দাঁড়ানু ক্ষণেক,—ঝুড়ির উপর উচ্চ—
আমার বুকের ব্যথা নহে, এ-তো বন-কেতকীর গন্ধ!
ইতি-উতি চাহি পড়িল নয়নে,—ঘুচিল মনের সন্দ,—
মালীর মথায় কুড়ি-দুই-দেড় কেয়া-কুসুমের গুচ্ছ।
আসি কাছাকাছি ওরই মাঝে বাছি কিনে ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁঝে আগাগোড়া ভিজে খুশিমনে এনু বাড়ি!
শয়নঘরের হুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।

বাহিরে তখনো ঝরিছে বর্ষা, থাকে-থাকে ডাকে দেয়া,
ভিতরে আমার শয়ন-শিয়রে গন্ধ ছড়ায় কেয়া।
রাত দু-পহর, স্তব্ধ শহর, কাঁদে নিশি নিশ্চন্দ্রা,
কেতকী-গন্ধে কত কি ভাবিতে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা।
কে জানে সে কোন্ বনে,
কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে আঁধারে সংগোপনে!
শ্যামপাতে ঢাকা শ্বেত কিশলয়, তাহে ঢাকা পীত-রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু।
এল বায়ুরথে মত্ত ভ্রমর নূতন মধুর লোভে,
তরুমূলবাসী বিষভুজঙ্গ ফণা তুলে ফোঁসে ক্ষোভে।
বাদল দারুণ, বিধি অকরুণ—কি হতে কি হল হায়।
গন্ধ ধরিয়া শহরের মালী গ্রাম ছেড়ে বনে যায়।
উড়ায়ে ভ্রমর মারি বিষধর শহরের পাকা মালী

বৌবজারের মোড়ে বিকাইতে কেয়ায় ভরিল ডালি।
তারি মাঝে যারে বাছিয়া আদরে আমি আনিলাম ঘরে,
এ বাদল রাত্তি যারে করি সাথী কাটাই কাব্যভরে,
যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে।
আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি!
কষিয়া কোমব বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা!
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম প্রাণবন্ধো!
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে মৃত কেতকীর গন্ধ!
হাঁকিল পাহারা,—উঠি ধড়মড়ি দু-হাতে খসানু ফাঁসি,—
ঝর-ঝর ভুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি!
কাঁটা বিঁধে হাতে বুঝিনু,—স্বপন, আমারই মনের ভুল ;
দু-পর রাতের ঘুম মাটি করে দু-পইসে কেয়াফুল!

সে হতে বন্ধু হায়!
এমন ঠাণ্ডা বাদল রাতেও জেগে বসে আছি ঠায়!
বনের বেদনা পথে বিকাইছে,—কি মোর কপাল-ভোগ,—
গন্ধের লোভে কিনে এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ!
চোখে-মুখে-গায়ে কে যেন মাখায়ে দিয়েছে লঙ্কাবাটা,
বুকে ফুটে আছে কেয়ার গন্ধ, হাতে ফুটে আছে কাঁটা।
বাহিরের জ্বালা জ্বালায় ভিতর, ভিতর জ্বালায় বা'র—
—জ্বলে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ-বাতি পথে-পথে সারে-সার।
ওগো জাগরণ-সাথী!
কখন কাটিবে অনিদ্-রাতি এ, নিবিবে পথের বাতি?
রিম্-ঝিম্-ঝিম্ ঘুমায় যামিনী, আমি কান পেতে থাকি,
যদি ডেকে উঠে অরুণ-বিহীন ভোরের করুণ পাখি!
ঘুম-ঘুম-ঘুম,—কোথায় বা ঘুম? হায় গো বন্ধু হায়!
বাদল-মেঘেতে অস্ত-চাঁদের আদল কি দেখা যায়?
নয়নের নিদ্ নয়নে রুধিতে আঁখিপাত মুদি মিছে,—
অন্ধ আকাশে উড়েছে সে কেয়াগন্ধের পিছে-পিছে।
পথে-পথে রাতে এই বর্ষাতে তুমিও যে ঘোর ভাই,
তোমারেও তবে ধরেছে বন্ধু আমারই অনিদ্রাই!
মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন্ কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা?

মুক্তি-ঘুম

দূর-দুর্গম দুর্গের আড়ে সূর্য অস্তে নামে,—
বন্ধুর সাথে দেখা হল পথে শ্রীচৌরঙ্গীধামে।
ভরা দখিনায় ভেসে চলে যায় বৈশাখী শনিবার,
সন্ধ্যাবিহারী শ্বেত নরনারী, হাওয়াগাড়ি অনিবার।
দখিনার ঝড়ে নুয়ে নুয়ে পড়ে শ্যাম-পথতরুদল,
চলে তলে-তলে রূপবিলাসিনী যৌবন-বিহ্বল।
ইষ্টসিদ্ধ অক্টর্লোনি ইষ্টকযোনি পেয়ে—
অম্বরে অঙ্গুষ্ঠ উঠায়ে উদাস রয়েছে চেয়ে।
মাঠঘেরা বাড়ি, একপাশে তারি ডালছাঁটা অশ্বত্থ,
পথভোলা এক বেহায়া কোকিল তাহে পঞ্চম-মত্ত।
বাঁকাচোরা বুড়া বলরামচূড়া ফুলে-ফুলে লালে-লাল,
শ্যামল আঁধারে লম্পট হাওয়া লুটে বকুলের ডাল।
দম্‌কা দখিনা বহি আনে শত গন্ধের সন্দেহ,—
পাষাণ-চাপা ও শহরেরও বুকে কত বসন্ত-স্নেহ!
বৈশাখী সাঁঝে জনতার মাঝে তড়িৎ-দীপ্ত পথে
আমারে দেখিয়া থামিল বন্ধু, নামি এল রথ হতে!
'এমন সময় এদিকে কোথায়?' কহে বিস্ময় মেনে,
'তোমার ডেরা তো চিরকাল জানি ছকু-খানসামা লেনে!'
আমি কহিলাম—'চলেছিনু ভাই তোমারই যে সন্ধানে,
আজ সন্ধ্যায় মোর সাথে চল আমার বাসার পানে।'

রাত্রি তখন অধিক হয়েছে ছকু-খানসামা লেনে,
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দিল টেনে।
আমি ও বন্ধু নির্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি—
দিক ভুলে গিয়ে রাতের দখিনা ঘুরে মরে অলিগলি।
পৌঁছি বাসায় পরিচিত সিঁড়ি বাহিলাম চুপি-চুপি,
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জ্বালি কেরোসিন কুপি।
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কুণ্ঠিত সমাদরে,
রাতের মতন দুয়ার রুধিনু আমার শয়ন-ঘরে।
চরণ চাপিয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে
'বল-বল ভাই মুক্তি কোথায়? চরকা না বন্দুকে?'
হাসিয়া বন্ধু পরম যতনে অঙ্গে বুলায় কর,
কানে-কানে কথা কহে অতি মৃদু গোপন-গভীরতর।
স্নেহের পরশে আঁখি মুদে আসে,—গরাদের ফাঁকে-ফাঁকে

সাগরের হাওয়া কাঁপায় কোণের কেরোসিন-শিখাটাকে।—
তন্দ্রা আসিলে বুঝিনু—বন্ধু কহিতেছে কানে-কানে,—
'চরকাও বুঝি বন্দুকও বুঝি, মুক্তিরই নেই মানে।
ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
জীবনে-মরণে কোনখানে কভু সত্য মুক্তি নাই।
ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে,
মুক্তি না পেয়ে ভোলা শঙ্কর মাঝে-মাঝে যায় ক্ষেপে।
জল হতে তুলে শুক্তি ভাঙিলে মুক্তা মুক্ত নয়,
দল বেঁধে তারা নূতন বাঁধনে কণ্ঠে দুলিয়া রয়।
রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।
ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধনলীলা,—
চরকা ঘোরে তো ঘোরেনাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা!
সৃষ্টি তো শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে-পাক,—
এরই মাঝে থেকে মুক্তি বন্ধু, সৃষ্টিছাড়া সে ডাক!
বন্দুক হতে যে মুক্তিস্রোতে জড় কন্দুক ছুটে,
সেই মুক্তির ঘূর্ণাবর্তে তুলো সুতো হয়ে উঠে।
আসল মুক্তি এতে-ওতে-তাতে নেই যে তা নিঃসন্দ,
নকলের তরে চরকা এবং বন্দুকে বৃথা দ্বন্দ্ব!
যতেক মুক্তিপন্থী,—
পুরনো গ্রন্থি শিথিল করিতে কষে দৃঢ় নবগ্রন্থি।
প্রোথিত দণ্ডে বসনখণ্ডে রঙিন বাঁধনে বাঁধি
মিলি তারই তলে ভাবে দলে-দলে মুক্তিসাধন সাধি।
মাটির কারায় যে তপস্যার বীজেরা বক্ষ চিরে,
তারি ফলে উড়ে মুক্তির ধ্বজা দীঘল তালের শিরে।
সেই মুক্তির আনন্দ তার আকণ্ঠ ভরে রসে,
ক্লিষ্ট মানব সে রস ভুঞ্জি মাতাল হইয়া বসে।
কে দ্যাখে বন্ধু, মুক্ত বীজের নিশানের তলে-তলে
ফলের কারায় নব বীজ হায় বাঁধা পড়ে দলে-দলে।
একক বীজের মুক্তি
সাথে বহি আনে লক্ষ বীজের নব-বন্ধন-চুক্তি।
রসমাতাল ও মুক্তিমাতালে প্রভেদ জানিহ খোড়া,
একজন কাটে তালের আগা ও আরজন কাটে গোড়া।

যুগ-যুগ ধরি এই বিশ্বের যতেক মুক্তিকামী।
তপ্ত তাওয়ায় কাটা কই হেন বিফলে উঠিছে ঘামি।

তার মাঝে যার বেদনা অসহ, সেই ছট্‌ফট্‌ করে,
তেলের-নুনের আইন না মেনে আগুনে ঝাঁপায়ে পড়ে।

ঘোর ঘর্ঘর ঘ্যানর-ঘ্যানর দ্রিমি-দ্রিমি দ্রাম-দ্রুম!
মোর বরে তোর কানের ভিতরে সমান ঢালুক ঘুম,
ঘুমা গো বন্ধু ঘুমা,—
শুনিসনে ভাই মুক্তির লাগি কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।
ও কাঁদনে যদি কাঁদন মিলাস থামিবে না ক্রন্দন ;
দুটি ক্ষীণ বাহু, কত কাটিবি রে বন্ধনে বন্ধন?
নিশার আকাশে একা নিরুপায় মুক্তি কাঁদিছে বসি
তারায়-তারায় জাল বুনে দিল বাঁধনের রসারসি!
মুক্তির আশে চিরক্রন্দন—তারই নাম জাগরণ,—
সে জাগরণের কত যে বেদনা, জানি তাহা মনে-মন।
তাই আমি যারে ভালবাসি তারে পরাই ঘুমের টিপ,
ঘুমাও বন্ধু ঘুমাও-ঘুমাও, এই নিবাইনু দীপ!
যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর-আঁখি চির-আধনিমীলিত,
যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরিগুহায়িত,—
সেই ঘুম হতে এনে
তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু হুকু-খানসামা লেনে।
যখন ঘটিবে যে রঙ্গ চৌরঙ্গীর মোড়ে-মোড়ে—
গোপনে-গোপনে আপনি আসিয়া স্বপনে শোনাব তোরে।
মোর 'পরে তুই বিরূপ হলেও ভালোবাসি তোরে ভাই,
ঘুমের পাতালে গুম করে তোরে দ্বারে আমি জাগি তাই।'

সায়ম্
১৯৪১

বোঝা

কার কৈশোরে কিশোরী হইয়া
আমারে প্রথম ভুলালে প্রিয়া?
যৌবন-যোগে দেখা দিলে ফিরে
কার কৈশোর কাহারে দিয়া?
কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু?
আজি তাও পুনঃ কে লয় টানি?
যা নহে তোমার তাই দিতে মোরে
কেন চিরদিন প্রয়াস রানী!
আজি নিশিশেষে বসে মুখোমুখি
নব-পরিচয় দু-জনে লব।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি
মিলাব নয়ন নয়নে তব।
আদি যুগ হতে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে?
যুগসঞ্চিত চুম্বন-ভারে
শ্রান্ত আনত অধর তব,
ভেবেছিলে সখী, তোমার সে ভার
আমার অধর পাতিয়া লব।
হায় সখী হায়, আমার অধরে
উছলিয়া পড়ে এ কার তৃষা
অসহ তাহার বহনের ভার—
নামাতে যে চাহি অহর্নিশা।
কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হতে উড়িয়া চলে?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।

কোন্ অশোকের চৈতী ঝরণ
ও-কপোল-তলে শুকায়ে উঠে?
কোন্ পঙ্কের পঙ্কজকলি
গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে!
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে!
এবারের মতো শিহর ভুলিছে
কোন্ কদম্ব ও-রোমকূপে!
এবারের মতো ফুলন ফুরায়
কোন্ চম্পক তোমার রূপে?
কোন্ কুহকীর কুহু-কুহু-কুহু
ভেঙে আসে তব কণ্ঠ-আড়ে!
কোন্ সে চাঁদের মধু পূর্ণিমা
ভোর হয়ে যায় ও-তনুপারে!
অজানা মধুপ, তারই তৃষাতরে
বহ সখী কার গন্ধশোভা?
তাই বারবার কুঞ্জে তোমার
বসে আর ভাঙে পুষ্পসভা।
অমন করিয়া চেয়োনাকো সখী
কাঁপায়ে চোখের সজল পাতা,
দুটি বাহু দিয়া কণ্ঠ বাঁধিয়া
বঞ্চিত বুকে রেখো না মাথা।
তনু হতে তনু, দীপ হতে দীপ,
যে অতনু-শিখা জ্বলিছে চির,
আমার বুকের জতুগৃহে তুমি
সেই দীপ আজও জ্বালায়ে ফির।
আমার বুকের জতুগৃহখানি
রচিত না জানি কাহার স্নেহে,
এ স্নেহের ভার এ দীপের হার
ধরি দিব বল কাহার দেহে?

আমরা দু-জনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,

অসীমপুরের রাজপথে-পথে
ফেরি হেঁকে-হেঁকে গাহক খোঁজা!
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায়-সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা।
তোমার পশরা রূপে-রসে-গানে
ভরা আছে যেন ফুলের ডালি,
আমার পশরা রয়েছে বোঝাই
ক্ষুধাতৃষ্ণায় অনাদি কালই।
হেঁকে চল তুমি—চাই সুধা চাই—
ঘরে-ঘরে ফুটে তৃষিত আঁখি,
আমি হেঁকে চলি—চাই ক্ষুধা চাই—
ভিড় করে আসে সুধার ফাঁকি।
অমৃত-বাহিনী হায় মায়াবিনী,
ছলে বাঁধি মোরে প্রণয়-ডোরে,
আপনার বোঝা সুবহ করিতে
কার সুধা তুই পিয়াস মোরে?
নূতন বোঝায় মাথা ভেরে যায়,
টলে যে চরণ, চলি কি মতে?
অধরে-অধরে ধরাধরি করে
মিলনের বোঝা নামাস পথে।
অসীম পথের নূতন পান্থে
একে-একে তুই আনিস ডাকি,
কচি-কচি শিরে বোঝা তুলে দিস,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথপাশে বসি ক্ষণেক জিরাই,
উঠে কলরব মোদের ঘেরি—
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি!
পুনঃ কি দুরাশে তোরি পাশে-পাশে
চলি মহাপথে চিরভুখারি,
হায় মায়াবিনী সুধাপশারিনী
পথিকের পথক্লিষ্টা নারী!

রবিপ্রণাম

দূরে অস্তগিরিচূড়ে
রক্ত মেঘকেতু উড়ে,
দিবা হয়ে আসে অবসান;
'জয়তু অরুণচ্ছবি'
'জয়তু প্রসন্ন রবি'
উঠে বৈকালিকী স্তবগান।
আসন্ন রাতের ভয়
কেমনে বা করি জয়
কলকণ্ঠ তুলে বনপাখি?
তারা কি গো জানে মনে
নিশান্তে উদয়-ক্ষণে
ও-রবি দিবে না কভু ফাঁকি?
যে রবি পশ্চিমে ডুবে
নিত্য পুনঃ উঠে পুবে,
আমাদের সে রবি যে নয় ;
যে রবির পাখি মোরা
আকাশে নাহি যে জোড়া,
ডুবিলে তো হবেনা উদয়।
তাহারি সাঁঝের পাখি
মোরা তারে পিছু ডাকি
কহি আজ—ওগো বন্ধু শোনো,
হোথা কি দেখিছ চেয়ে?
উঠে কি দিগন্ত বেয়ে
সন্ধ্যার মতন ছায়া কোন?
নয় তো ও সন্ধ্যা নয়,
হয়তো মোদেরি ভয়
দিক্‌পারে রচে অন্ধকার।
ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখা মেলি
স্তব গান ছায়া ফেলি
যুগান্ত হতেছে না তো পার?
হয়তো তোমারি ছন্দে
বাঁধিতে নূপুরবন্ধে
দলে-দলে অপ্সরীরা নামে,—

তাদেরি রঙিন বাসে
মায়াসন্ধ্যা উড়ে আসে
তাদেরি কাজল কেশদামে।
হয়তো তোমারি পাশে
দূতমেঘ ফিরে আসে
বহি তব প্রিয়ারই বারতা।
হয়তো বা এতকালে
কালের উদাস ভালে
তব সুরে ঘনাইল ব্যথা।
আমরা নিচের পাখি,
এ পাখা বিধির ফাঁকি,
আকাশের সংবাদ না পাই,
ঘটিছে যা লোকে-লোকে
ছায়া পড়ে তব চোখে,
তাই বন্ধু তোমারে শুধাই—
দিক হতে ঘুরে দিক
তুমি কি জেনেছ ঠিক
এ জীবন নহে মরীচিকা?
মরুব্যোমে প্রাণঝড়ে
তবে কেন ছিঁড়ে পড়ে
উড়ে-লাগা অকস্মিকী শিখা?
জ্বলে-নেভে দীপমালা,
তা লয়ে সাজায়ে ডালা
অদিত্যপিণ্ডের আরাত্রিকে,
শূন্যমুখে বাষ্পাম্বরা
বারংবার ঘুরে ধরা
বিধিবদ্ধ আহ্নিকে বার্ষিকে।
এই পূজারতি-মাঝে
এ দীপ লাগে যে কাজে
তাহে বন্ধু না পাই সান্ত্বনা,
যত জ্বলি মনে হয়
জ্বালার এ অপব্যয়,
কেবলই তো আপনা-বঞ্চনা।
অমৃত যাহার গান,
সেও যদি ম্রিয়মান,
তবে বন্ধু কার মুখে চাই?

তোমারও জয়ন্তী দিন
নহে পরাজয়-হীন,
তবে আর কার জয় গাই?
জানি বন্ধু জানি জানি,—
তোমার কণ্ঠের বাণী
বিশ্বজনে রেখেছে ভুলায়ে,
ক্ষিতির কুসুম-মালে
ব্যোমকেশ-জটাজালে
তুমি বন্ধু দিয়েছ দুলায়ে।
জানি ওগো জানি ফের
জরাতুর বসন্তের
তুমি এসে ফিরালে যৌবন,
অশ্রুক্লিন্ন অন্ধরাতে
আষাঢ়ের আঁখিপাতে
নামাইল নবীন ক্রন্দন।
হেন রবি প্রাণময়,
তারি রাত্রি অনুদয়!
জড়পিণ্ড ডুবিবে-উঠিবে?
মূঢ় বিহঙ্গম দল
নিত্য করি কোলাহল
চিরদিন তাহারে বন্দিবে?
এই অভিমানে মোরা,
শঙ্কা লয়ে বুকজোড়া,
মোদের রবির গাহি জয়।
জগতে তো কত ভ্রম,
কত হয় ব্যতিক্রম,
এ-সন্ধ্যা কি না হলেই নয়?
ভবিষ্য নিশার পাখি
আকাশ-বাতাস ছাঁকি
তব গীতে কণ্ঠ ভরি লবে ;
যে কণ্ঠ গাহিছে গান
তাহে জয়মাল্য দান,
হেন ভাগ্য তাদের না হবে।
সেই অহঙ্কারে আজ
ভুলিয়া আসন্ন লাজ
আমরা সাঁঝের পাখি তব

'জয়তু প্রসন্ন রবি,
পাখির প্রাণের কবি।'
ক্ষীণ কণ্ঠ ঊর্ধ্বে তুলি কব।
এ পঞ্জরে রক্তমাখা
যে পাখি ঝাপটে পাখা
বন্ধন-বেদনে অবিরাম,
ছিন্ন তার ওষ্ঠপুটে
যে গান কাঁদিয়া উঠে
সেই গানে করে সে প্রণাম।

কৃষ্ণা

কে তাপস প্রতিহিংসা-যজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ত্মে ঢালিল হবি?
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখা-শতদলে জন্ম লভি।
আকাশে হইল দৈববাণী—
জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান যত অসাবধানী!
অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবী, আপন পুণ্যে-পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমাকে পরশি হে হুতবহ!
যুগান্তের সর্ব নরের
হে নারী, ভক্ত প্রণাম লহ।
শুনিল যেদিন এই ভারতের
উদ্ধতশির ক্ষত্রসবে
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে বহি
আকাশে লক্ষ্য বিঁধিতে হবে,
এল দলে-দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ংবরের সে সভাতলে.
তুমি দিলে মালা—চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারি-গলে।

অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারী, হেরিলে তুমি
যত কাপুরুষ রাজার রক্তে ·
রঞ্জিত হল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারির শ্রবণমূলে,
স্বর্গ হইতে বাণে ভরা তূণ
নেমে এসে তার পৃষ্টে দুলে!
তব দয়িতের ছদ্ম বীর্যে
বিস্মিত হল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কিনা—
সে কথা জানে না বেদব্যাসই।
ভিখারির সাথে ফিরিয়া কুটিরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চপতি!
নিশীথ-ঝিল্লি থামিল কাননে,—
বিকার-বিহীন তুমি গো সতী।
তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি?
উঠেছ অনলে নারীর গর্বে
নারীর গর্ভ তুচ্ছ মানি।
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জনী তুলি দিলে বৃকোদলে,
মধ্যমা, হাসি পার্থবীরে,
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা—
ধরিল নকুল হৃষ্ট মনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে।
পাঁজি-পুঁথি লয়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।
কেহ বলে তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাংখোর ভোলা দিল পাঁচ বর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে।

কেহ বলে তুমি অন্য জন্মে
স্বামী লাগি পুনঃ বসিলে তপে।
পঞ্চদেবতা আসি একসাথে
তোমারে তাদের হৃদয় সঁপে।
সে-সব কাহিনী জানি বা না-জানি
তেজস্বিনী গো তোমারে চিনি,
আপন-যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্মে-জন্মে তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি,
তাই গো সাধিব পঞ্চপ্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।
মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী,
সে দিল পরখ অনলে পশি ;—
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা,
তার সতীত্ব কোথায় কষি?
* * *
রাজসূয়ে যারা করেছিল রানী,
জুয়া হারি তোমা বেচিল তারা ;
হে শিখারূপিণী! না-জানি কেমনে
সেদিন হওনি ধৈর্যহারা।
মর্মান্তিক জাগরণে জাগি
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি?—
শুনিলে যখন আজ হতে তুমি
নূতন রাজার পুরানো দাসী?
দম্ভস্ফীত সে রাজশাসন
কটি হতে তব বসন টানে,—
হুতাশন হতে হুতাশনশিখা
গতাসু বিনা কে ছিনায়ে আনে?
পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,
ধর্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে!
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে?
শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী,
প্রমোদ-রাতে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তারি।

সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
ফুটিল তোমার নয়ন-পাতে,
দেখিলে চাহিয়া কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের শকুনি-সাথে।
কর্ণে-পার্থে কি পার্থক্য?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে?
ধর্ম সে শুধু নরের জন্য
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে।
দুঃশাসনেরই স্বজাতি ভীষ্ম
মর্মে সেদিন বুঝিলে মা তা—
ক্রুর নগ্নোরু দুর্যোধন যে
বিমূঢ় গদারু ভীমেরই ভ্রাতা!
সেদিন আকাশে লিখে দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা,—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।
তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণ মেঘের বক্ষে ফুটে ;
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণি জাগিল?
সারা অম্বর চরণে লুটে!

বর্ষাবারিত দাবাগ্নি-সম
ভ্রম বনে-বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্বে
নারীজীবনের সর্বদুখই।
হীন পরিচয়ে কাটে কতদিন
বিরাটের হীনা রানীর ঘরে,
কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বাম পদে তোমা প্রহার করে।
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে
পতঙ্গ-সম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে!
ঘুরে যায় চাকা, দুরে যায় দেখা—
প্রলয়-শীর্ষে ছুটেছ রানী!
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি।

অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পড়ে গেল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে।
মরে কুরু, মরে পাণ্ডবদল,
মরে পাঞ্চাল নির্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে মারে সাত বীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কারে?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী।
যত নারী যেথা হল লাঞ্ছিতা,
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,—
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,
কে লুটে আঁধারে ভগ্ন-উরু!

তবু কোথা শেষ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্ত-ঘাতক-করে—
কাঁদে ফাল্গুনি কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ক্ষরে।
তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়েছে ফাঁকি,
তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার রয়েছে বাকি।
দিলে অনুমতি—"নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে
মিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।"
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থামা
আজও ছোটে শুনি মাটির তলে,
অমর তাহার দেহদীপাধারে
কি অনির্বাণ মরণ জ্বলে!

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,

কে জানে সেদিন কোন ব্যথা নারী,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে।
সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
শূন্য তোমার দেউল-তলে,—
কোথা ধূপমালা, উপচার-থালা?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে।
ম্রিয়মাণ তার পাণ্ডুর ভাতি
কাঁপে মন্দির-অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
মূর্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহে না আরতি,
সে অনলে আর বহে না হুত,
বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
নিখিল নারীর অশ্রুপ্লুত।
মন্দির ছাড়ি দাঁড়ালে দুয়ারে
চাহিয়া সে শীত নিশীথ-নভে,—
দূরে-দূরে যারা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তারা দিল কি সবে?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসী,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটিকা?

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি!
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখী!

কুরঙ্গিণী

মনোমরুবাসী হে চিরপিয়াসী
কুরঙ্গিণী!
বুকের মাঝার শুনি না তো আর
তব চরণের ড্রিনিকি-ড্রিনি।

দীপ্ত নভের রুদ্র কৃষক
খেয়াল-সুখে
আসে-যায় আর যে বীজ ছড়ায়
সহস্র করে বালুর বুকে,
তারি অঙ্কুর খুঁটিয়া খেয়ে,
দিগ্‌দিগন্তে চলিতে ধেয়ে,
অন্তর-পথে মরুমরুতের
অজানা জলের গন্ধ পেয়ে।
কুরঙ্গিণী,
শুনি না তো আর বুকের মাঝার
পিয়াসী পায়ের সে দ্রিনি-দ্রিনি।

ছায়া-যবনিকা মিছা মরীচিকা
মরুর পারে—
টল-টল জল নিতল-শীতল
দূর খর্জুর-বীথির আড়ে,—

চাহি তব মুখ বঞ্চিত বুক,
দিনু তা মুছে,
মায়া-তুলিলিখা মৃগতৃষ্ণিকা
নিঃশেষে সে তো গিয়েছে ঘুচে।

আজি দেখ চাহি দূরে ও দূরে,
লেলিহ গগনে আগুন ঝুরে,
মরু জুড়ে শুধু মরুঝড়ে ধু-ধু
তপ্ত বালুকা ঘুরিয়া উড়ে।

এ মরুভূমি
তৃষ্ণা-সাগরে জোয়ার জাগাল,
হে চিরতৃষিতা কোথা গো তুমি?
আপনারে দহি কান পেতে রহি
কুরঙ্গী রে!
যদি উঠে দূর চরণের সুর
কৃশানু-রেণুর ঝর্নাতীরে,—
যদি কোনদিন দৈব-অধীন
ভাসিয়া আসে
তব পিপাসার ঘন দুঃশ্বাস
দগ্ধ দিকের দীর্ঘশ্বাসে।

হায়রে বৃথাই দিবস কাটে
সূর্য লুটায় অস্ত-পাটে,
তোমার পায়ের চিহ্ন ফুটে না
রাঙা সন্ধ্যার ভাঙা আঘাটে।

কুরঙ্গী রে,
বালু ফুঁড়ে দূরে উঠে মৃগাঙ্ক—
আমি ভাবি তুই এলি বা ফিরে!
যুগান্ত ধরে দিগন্ত তোরে
প্রবঞ্চিছে,
তাই তোরি লাগি হায়রে অভাগী,
করিনু যে শ্রম হল কি মিছে?

রুদ্রের ভাল দহে চিরকাল
বহ্নিশিখা,
ছিল নিদ্রিত তাই সে সহিত
ললাটে মিথ্যা জলের টিকা।

আজি সেথা পুনঃ অগ্নি ক্ষরে
মরীচিকাজাল ছিঁড়িয়া পড়ে,
দিগম্বরের গ্রন্থি কষিয়া
জেগে বসেছে সে দিগন্তরে!

হে মরুমৃগ,
যতদূর চাই মরীচিকা নাই,
এ মরুরে তাই ত্যজিলে কিগো?
শস্যশ্যামল সজল বনের
হরিণী তুমি,
কবে কি কারণ করিলে বরণ
ধূসর ঊষর এ মরুভূমি?

তাহার দাহনে তোমার পিপাসা
মিটিল না তো,
সজল বনের কাজলে আঁকিয়া
পিপাসু চোখের আঁজল পাতো।

আশাতুর সেই তৃষার টানে
বহ্নির চোখে সলিল আনে,

ঠিক দুপ'হরে দিক্-সীমা'পরে
বসে যায় মরু জলের ধ্যানে।

হে পিপাসিতা,
গেল পিপাসার সব গৌরব
তোমারি মায়ায় বোঝনি কি তা?
বনের পিপাসা ধন্য—জলের
অন্বেষণে,
মরুর পিপাসা সার্থক শুধু
জলের আশার বিসর্জনে।

বনের পিয়াসা মরুর বক্ষে
আনিলে বহি,
কাঁদালে তাহারে বারে-বারে-বারে
একই ব্যর্থতা নিত্য সহি।

ঘুচানু সে তব অবমাননা,
মিছার পিছনে সে লাঞ্ছনা।
কে জানিত হায় বাঁধিতে তোমায়
প্রয়োজন ছিল প্রবঞ্চনা।

হে মায়ালোভী,
বুঝি নহি আমি চেয়েছিলে তুমি
জলের অভাবে জলের ছবি!
আজি কি পূর্ণ,—নিয়ে এসেছিলে
যে অভিলাষ?
সাঙ্গ কি হল গিরি-বিহারিণী
বনহরিণীর মরুবিলাস?

এতখন তুমি ফিরি বনভূমি
আছ কি শুয়ে?
পিয়াল-রেণুতে ভরা তনুখানি
গিরি-ঝর্নার সলিলে ধুয়ে।

মরুর পিপাসা মরুর বুকে
আজ হতে একা মরুক ধুঁকে,
চঞ্চল তব চরণ-পরশে
কাঁপুক কানন শিহর-সুখে।

হে বনমৃগ,
নিত্য-নিরাশ ছাড়ি মরুবাস
তোমার তিয়াস মিটিল কি গো?

বেদিনী

ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ
ঝোড়ো মেঘে দিক ঘেরা,
ওঠরে বেদিনী মোট বেঁধে নিই
তুলিতে হইবে ডেরা।
দখিনার লোভে খোলা মাঠে তুই
বসালি তাঁবুর খোঁটা,
ভাঙা-ফাটা-ফুটো তৈজস গুটো,
সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।
ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী,
দখিন হাওয়া এ নয়,
ঈশান কোণের ফণীর ফণায়
বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,—
ওঠরে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে
বেদিয়ার হাত ধর।

কি হল বেদিনী তোর?
উড়ো মেঘে রাখি নিশ্চল আঁখি
কোন্ বেদনায় ভোর?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা
কেমন করে কি মন?
মাঠে-মাঠে আর ঘাটে-ঘাটে ঘুরে
ক্লান্ত কি এ জীবন?
বেদিয়ার বালা সাধিয়া দিলি যে
বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস তুই এদের বংশে
নাই যে ঘরের জ্বালা।
বেদের ধারা তো বুঝিস বেদিনী,—
যে ঘর বাঁধে সে দিনে

রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার
ঢেকে যায় শ্যাম-তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি
এতকাল পরে হলি তুই আজ
সেই ঘরে অনুরাগী?

বেলায়-বেলায় পথের খেলায়
বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের 'পরে পথের কুকুর-ও
নহে কভু উদাসীন।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে,
মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী,
ভরা বুকে বুক চাপি।
তুই আর আমি পথে-পথে ভ্রমি
সাথে শততালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কালভুজঙ্গী
চিরসাথী শির'পর।
এ সবে কি রুচি নাই?
ঘরের মায়ায় ঝড়ের আকাশে
নয়ন মেলিলি তাই?

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর
চুলে বাঁধিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে
শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি বনে-বনে
হাতে ছাগলের দড়ি.
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস
ফুলের ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপানো হৃদয় হইতে
ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘোরের ঘরণী রে তুই
ঘাঘরায় দিস তালি।
তবু যে বেদিনী বেদেরি ভক্ত—
বিস্ময় সবে মানে,
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায়
মোহিনী-মন্ত্র জানে।

শোন্ রে বেদিনী শোন্
শুরু হল ওই অদূর আঁধারে
গুরু-গুরু গর্জন!
ঘরের মায়া সে থাকে তো এখনও
কেটে দে তাঁবুর রশি,
না হয় কাটাব এ কালরাত্রি
খোলা মাঠে খাড়া বসি।
আকাশ জুড়িয়া কোন্ সাপুড়িয়া
বাজায়ে চলেছে তুরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী
ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ,
নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রশির ফাঁসে ওই দ্যাখ্
ঘন-ঘন পড়ে টান।
কেন উদাসীন আন্‌মনা হেন
বেদিনী, বেদের মেয়ে?
দূরের বাঁশির সুরে তুইও কিরে
উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে?
* * * *
অকালে এল এ কালবৈশাখী
কাছে আয় কাছে আয়,
যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী
যা ছিল তাও যে যায়।
ছুটে যায় খুঁটো, উড়ে ছেঁড়া তাঁবু,
টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কানাভাঙা হাঁড়ি,
দূরে-দূরে গড়াগড়ি।
অকালের এই কালবৈশাখী—
ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে
বেদিনী রে হাত ধর।
ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ তো ওড়ে না—
ভয় নাই ভয় নাই,
এ মাঠ ছাড়িয়া চলরে বেদিনী
আর কোন মাঠে যাই।

হাওয়ার উজানে দিক ঠিক রেখে
আঁধারে আঁধারে চল্—
আকাশে খেলায় লয়া-লয়া সাপ
পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস মিছে, আয় পিছে-পিছে
যা হবার তাই হোক—
বেদে-বেদেনীরা ভয় পায় যদি—
হাসিবে গাঁয়ের লোক।

বরনারী

শূন্য কুম্ভ-সম
শূন্য জীবন মম
কাঁখে তুলে নদীকূলে এলে বরনারী,—
কেন নামিলে না নীরে?
বেলা পড়ে এল ধীরে,
চলিয়াছ ঘরে ফিরে ভরি আঁখিবারি।
না মোরে ডুবালে জলে,
না ভাসালে লীলাছলে,
বুকে চাপি কুতুহলে দিলে না সাঁতার।
কেঁদে-কেঁদে গলা ধরে
ভরিয়া তুলিলে মোরে,
ঢালিলে এ খালি বুকে অশ্রুর পাথার।
পল্লীবধুর সারি
আসে হাসে ভরে বারি,
বাতাস ভরিল জলভরণের সুরে,—
কূলে বসি অধোমুখ
তোমারি ফুলিছে বুক,
কি দুখে ও কালো আঁখি সারাবেলা ঝুরে?
এখন চলেছ ফিরে,—
সমুখে আঁধার ঘিরে,
পিছনে সজল হাওয়া বহে ঝর-ঝর,
ঝিল্লিরা ঝঙ্কারে,

জোনাকি ঝলক মারে,
বাঁকা কাঁকালের তালে নূপুর মুখর।
আঁধারে বুঝিতেছি না—
এখনো কাঁদিছ কি না,
ভরা এর কলসভারে ঘন বহে শ্বাস ;
তোমারি চলন-ঘায়,
মোর জল ছলকায়,
ভিজিয়া ভিজাই হায় তব কটিবাস।
পদতলে পথরেখা
যায় কি না-যায় দেখা,
এ পথে চলিতে একা তনু কেঁপে উঠে,
নাছোড় লতার বেড়ে
অপথে পড়িছ ফেরে,
না-জানি কোমল পায়ে কত কাঁটা ফুটে!
আঁধারের বাঁকে-বাঁকে
মেঘেদের ফাঁকে-ফাঁকে
চাঁদের কলসি কাঁখে চলে বিভাবরী ;
বনবায়ু ফিরে পাশ,
ছাতিমের ছুটে বাস,
বকুল ফেলিয়া শ্বাস ধীরে পড়ে ঝরি।
শুনি ও নূপুর-ধ্বনি
পথ ছেড়ে দেয় ফণী,
পেচক উড়িয়া বসে পাশের শাখায় ;
শ্বাপদ দাঁড়ায় সরি
দু-চোখে প্রদীপ ধরি,
বাদুড় ঝুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায়।
সুন্দরী, বল বল—
এ পথে কোথায় চল?
গহন এ অরণ্যে কারে মনে পড়ে?
তোমারি কাঁদনে-কাঁদা
তোমারি বাঁধনে-বাঁধা
কলস নামাতে বল চল কার ঘরে?
চির-দিবসের চেনা
সে-ঘরে কি ফিরিবেনা?
সন্ধ্যা কাঁদিয়া গেল কুটিরে যে তব;

কাহার চরণে ঢালি
আমারে করিবে খালি?
আজি রাতে ডাকে তোমা কোন্-অভিনব?
যে-তব আঁখির জল
এই বুকে টল-টল,
সে জলে মিটিবে বল কাহার তিয়াস?
চলিয়াছ, বাঁধি মোরে
কটিতটে বাহুডোরে
কাঁকন বাজায়ে কোন্ নূতনের পাশ?
যদি সে নূতন ঘরে
ও-আঁখি আবার ঝরে,
যদি ও-বিম্বাধরে কাঁপে ক্রন্দন,—
তবে নারী মাথা খাও
মোরে হেথা ফেলে যাও,
পথমাঝে খুলে নাও ভুজবন্ধন।
ভাঙা-ফুটো-শূন্যো হই,
যেথা-সেথা পড়ে রই,
হে মোর বেদনাময়ী, সহিতে তা পারি।
তোমার অশ্রুভার
বার-বার বহিবার
শকতি নাহি যে আর—শোন বরনারী।

মন্ত্রহীন

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতী,
গৃহিণী, সচিব, সখী হে প্রিয়া,
বয়স মোদের হয়ে গেল ঢের
পারে যাব কোন্ পাথেয় নিয়া?
কাশী-গয়া দূর, এইতো বেলুড়,
তাই বা সেখানে গেলাম কবে?
আকাশ এদিকে হয়ে এল ফিকে
সাধুসঙ্গ সে কবে বা হবে?
দুঃখ তোমার পঞ্চাশ পার,—
তবুও দীক্ষা নিইনি আমি,

শাস্ত্রে স্থির আছে নাকি, স্ত্রীর
হয় না মন্ত্র না নিলে স্বামী।
আপনি মজিনু তোমা মজাইনু,
ক্ষমা কর মোরে মমতাময়ী,
ছুটির বেলায় আজীবন ত্রুটি
সেরে নিব তার সময় বা কই?
তবু শোন সতী, গোপনীয় অতি
কহি আজ কিছু আশার কথা,
তোমার পতি যে মন্ত্র নেয়নি
শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র জনম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,
তব মুখ হতে আমার দেবতা
সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেইদিন হতে ওই তনু-মাঝে
তনু হারাইল দেবতা মম,
জপি আমি নাম— হে আমার কাম,
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম!
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতী,
গৃহিণী, সচিব, সখী হে প্রিয়া,
তোমারই তনুর ঝর্না-ঝরায়
আজও সুশীতল আমার হিয়া।
তারই গৌরবে গরবী যে আমি,
তারই দানে ধনী করেছে যে সে,
পলাশের ঝরা পলাশে যেমন
পলাশের তলা চৈত্রশেষে।
তাহারই পরশ অমৃত-সরস,
দরশ তাহার নয়ন-রম,
সে তনু নোয়ায়ে তুমি প্রণমিলে
মনে-মনে বলি—নমো হে নম,
নমো-নমো-নম সুন্দরতম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে-যুগে দেয় পরমানন্দ,
নরকের দ্বার বলো না কেহ।
বালগোপালের ধাত্রী ও-দেহ,
ধরা দিল মোর বাহুর পাশে,

ক্ষীর-সায়রের ওই তরঙ্গে
কত চাঁদমুখ ভাসিয়া আসে।
দেবতা আমার ভিখারি হইল
ওই ফুলে পূজা পাবার লোভে,
ওরই রসায়নে অতনু মদন
মদনমোহন মুরতি লভে।
ও-তনু আমার হেম-ধূপাধার,
রূপানল বহি জাগিয়া থাকে,
মুঠা-মুঠা মোর কামনা পুড়ায়ে
মন্দিরখানি সুরভি রাখে।
প্রিয়ার তনুর অনু-পারাবারে
তরঙ্গময় তড়িৎ নাচে,
সেথা ফুলে উঠে যে লীলাপদ্ম,
আমার দেবতা তাহাই যাচে।
ও-তনু পুড়িবে— ভস্ম উড়িবে,
সে-কথা আমার অজানা নহে,
বুকে রেখে তারে চোখে আসে জল,
তনু চুপে-চুপে আমারে কহে,—
আমি-ই আমার লীলাতরঙ্গে
গোপনে আপনা ভাঙি ও গড়ি,
সে ভাঙা-গড়ায় যে 'আছে' রয়েছে
সে থাকারে 'নাই' কেমনে করি?
শুধু ছল করে লুকাই বন্ধু,
কত কাঁদ তাই দেখিব বলে,
কত কেঁদেছিনু সে-কথা কহিতে
ফিরে-ফিরে আসি তোমারি কোলে।
আছি-আছি আমি, আছ-আছ তুমি,
আমি প্রিয়া আর তুমি যে প্রিয়,
আমার এ-রাঙা চেলির প্রান্তে
বাঁধা আছে তব উত্তরীয়।
যা ছিল আমার সঁপেছি চরণে
বসন-ভূষণ-সরম মম,
এবারের এই তনুর লীলায়
পেলে কি তৃপ্তি হে প্রিয়তম?
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতী,
গৃহিণী, সচিব, সখী হে প্রিয়া,

যে মন্ত্র তুমি কহ কানে-কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।
আমার গুরুর উপবীত নাই,
কণ্ঠে তাহার কনক-হার ;
শিরে নাই শিখা নাই জটা-জুট,
আছে বেণী আছে অলক-ভার।
কপালে নাহিকো ত্রিপুণ্ড্র-রেখা,
সিঁদুরের টিপ পরে সে ভালে।
তা বলে শাস্ত্র- সম্মত কিগো
ত্যাগ করা গুরু প্রৌঢ়কালে?
তদুপরি শোন আমার মতন
গুরুর ভাগ্য করিল কেবা?
রাতে দেয় কানে মুক্তিমন্ত্র
দিনে করে মোর চরণ-সেবা।
ধার দিয়ে তার অণুবীক্ষণ
বিশ্বরূপ সে দেখায় মোরে,
বিস্ময়ে হেরি তারি রূপ ঘেরি
আমার রূপের জগৎ ঘোরে।
পরশিয়া নীর বৈতরণীর
সহধর্মিণী শপথ করি—
এ নহে সত্য— নাস্তিক, তাই
মন্ত্রবিহীন জীবন ধরি।
বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে
ডুবিতে দেখেছি ও-রূপদহে,
তারে খুঁজে তাই সাঁতারি বেড়াই,—
বিশ্বাস নাই সকলে কহে।
তোমারি মিলন আস্বাদে মম
তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,
কত কটু তারে কহি বারে-বারে,
কভু অনুরাগে, কখনো রাগে।
বন্ধু, বন্ধু, হৃদয়বন্ধু,
কেঁদে-কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরি বাজায় সে শুধু
সকল সুখের আড়ালে থাকি।
সেই সুন্দর মম মনোহর
ধরা দিতে এসে দিল না ধরা,—

তবে আর সখী মিছে কেন যত
শুকনো পুঁথির মন্ত্র পড়া?
অশ্রুতে গাঁথা না-পাওয়ার ব্যথা,
সেই মালা জপি দু-জনে মিলে,
এস মোর জ্যোতি, এস মোর সতী,
মন্ত্র এবার নাই বা নিলে।

নাস্তিক

সেই দেশ, সেই পথ, সেই শালবন,
সেই শৈলচূড়ে ঘেরা মেঘল গগন,
সে-দিনের সেই প্রিয়া আজও সহচরী,
তবু আর শ্লথ চিত্ত নাহি উঠে ভরি।
জানি বন্ধু, তুমি মোর নহ প্রাপণীয়,
তাই কাঁদি চিরদিন—'ধরা দিও, দিও'।
প্রাপ্তি হতে বুঝিয়াছি পাব যা তা মিছে,
পাব না যা তাই সত্য, ছুটি তারি পিছে।
নিশ্চিহ্ন যৌবন ক্রমে দেহে-মনে-প্রাণে,
উপনেত্রে চেয়ে দেখি ধরিত্রীর পানে—
শ্যামলে শ্যামল নাই, নীলে নাই নীল,
বিস্বাদ-বিবর্ণ-জীর্ণ প্রাচীন নিখিল!
মহাশূন্যে ধরণীয় এই ভগ্ন নায়ে
আমার শেষের দিন আসিছে ঘনায়ে।
আলোকে খুঁজিতে তোমা ছিল আশা-ভয়,
আঁধারে খুঁজিতে হবে—নিরাশ নির্ভয়।

এ জীবনে যত যাহে হইনু বঞ্চিত
মরণের তীর্থে সবই হল কি সঞ্চিত?
শৈশব, কৈশোর মোর, অতৃপ্ত যৌবন,
আয়ুঃ-শক্তি-আশা-প্রেম কল্পনা মোহন,
সকলই কি গেছে ভাসি সেই মহানীরে—
পূর্ণগ্রাস-পুণ্যস্নানে ছুটি যার তীরে?
শ্বাস রোধি ডুব দিয়ে, মাথা তুলে চাব,—
অমনি কি নবরূপে সব ফিরে পাব?
মরণোত্থ বিস্মৃতির স্নিগ্ধ রসায়ন

ফিরে দিবে নগ্ন কান্ত শিশুর জীবন?
আবার আমারে ঘিরে হাসিবে এ-ধরা?
রজনী সাজাবে তার তারার পশরা?
চিত্তমাঝে অকারণ আনন্দের দোলে
নৃত্যরসে নবতনু পড়িবে কি টলে?
সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী?

মৃত্যুতলে তিলে-তিলে উঠিছে যা জমে
হয়তো ফিরিয়া পাব জনমে-জনমে
নব-নব রসে-রূপে। শুধু জানি হায়,
তোমারে পাইনি বন্ধু, পাব না তোমায়।
সকলের আছ তুমি, আমার যে নাই,
হেঁয়ালির দুঃখ মোর কারে বা জানাই!
আমার কাটিবে কাল চির-তোমাহারা,
নয়ন হেরে না যথা নয়নের তারা।
তুমি ক্ষিতি, তুমি জল-বায়ু-অগ্নি-ব্যোম্,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য-সোম।
স্থাবরের স্থিতি জঙ্গমের গতিধারা,
যেখানে যা কিছু তুমি,—শুধু আমি-ছাড়া!
মাঝখানে দোলে চির-লীলা-পারাবার,
তুমি-আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর তাই,—
হইয়া পরান-বন্ধু থাকিয়াও নাই।

চিরবৈশাখ

বন্ধু,
কাবার হতেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আনচান আইঢাই।
পীচে ও পাথায়, ঘরে কি ফাঁকায়, বাতাসে-হুতাশে হায়,
প্রাণের পরনে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।
এ-হেন দুপরে আফিসে আসিয়া হেরিলাম, কি আনন্দ,
কাল চন্দ্রের গ্রহণ হয়েছে, আজিকে আফিস বন্ধ!

বসে আছি তুমি-আমি,
মাথায় ঘুরিছে তড়িৎব্যজনী, ললাট উঠিছে ঘামি।
তপ্ত বোশেখে আকাশে বসে কে আগুন-ফোয়ারা হানে?
অদূর অশথে নবপল্লব মাতে সে অগ্নিস্নানে।
নারিকেল-শিরে ঝরে ধীরে-ধীরে সেই আগুনের ঝারা,
বাগানের কোণে সূর্যমুখীরা পান করে সেই ধারা।

নিবিড় তাদের আনন্দ হেরি মনে জাগে আজ মোর,
আমারো অঙ্গে লেগেছিল ভাই নবনিদাঘের ঘোর।
নবযৌবন সবে,—
বসন্ত ছাড়ি যোগ দিয়েছিনু নিদাঘ-মহোৎসবে।
বাংলায় বসে ভালোবেসেছিনু সুদূরের মরুভূমি,
সে ছিল না মোর ক্ষণিক খেয়াল সে কথা জানিতে তুমি।
দিগন্তহারা অন্তরে মম বালুর শয্যা পাতি
আগুনের খেলা কবে হবে বলে কাটাইনু দিন-রাতি
মাঝে-মাঝে তার জ্বলিয়া উঠিবে গগনপরশী শিখা,
দিকে-দিকে তার ভুলাতে চাহিবে মায়াময়ী মরীচিকা।
মোর অন্তরে-প্রান্তরে বসি কাঁকরে গুনেছি দিন,
কবে আসিবে সে চিরবৈশাখ কালবৈশাখী-হীন।
যার ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে নাই মল্লার সুর-কণা,
অঙ্গ বেড়িয়া প্রতপ্ত মেঘে ফুঁসে বিদ্যুৎ-ফণা!
জগৎকেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে অনল-স্রোতে,
যার দুর্বার অগ্নিবারতা ছুটিছে আলোক-রথে।
আনন্দ যার বহ্ন্যুৎসবে নাচে উচ্ছ্রিতশিখা,
যার চরণের ঘূর্ণাছন্দ নীহারিকা-বুকে লিখা।
মহাসূর্যেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে,
অন্তরীক্ষ ভরি নব-নব জগতের বীজ বুনে।
আনন্দের সে অগ্নিমূর্তি ভালোবেসেছিনু বলে
মন উঠেনিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে।
জলে ও আগুনে আপোস করিয়া যে বোশেখ হেথা আসে,
যার তেজ মোরা মাপি কূপোদকে, শুকনো ডাঙার ঘাসে,
যে আসে মোদের রন্ধনশালে ভিজা কাঠে চুলা জ্বালি
ধুঁয়ার ছলনে কাঁদিয়া আকাশে মাখাতে মেঘের কালি,
আমে আর জামে ঘামে আর প্রেমে বৈশাখী সে-জীবন,
অসহ্য বোধে চিরদিন আমি চেয়েছিনু বর্জন।
বন্ধু জানতো তুমি,—
বাংলার ছেলে ভালোবেসেছিনু কেন আমি মরুভূমি।

শোন গো বন্ধু, ওই পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক,—
দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।
মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে যা ভাঙা বুকে,
শীকরসিক্ত ঝাপটা লাগিয়া কখন সে যায় চুকে।
পঞ্চাশ পার, শুধাই আবার এখনও রাখিব আশা?
চিরবৈশাখ বাসিবে কি মোরে নির্জলা ভালোবাসা?
আমার হাতের তড়িতের হার উঠিবে কি বুক ঝলি?
চরণ পাতিয়া লবে সে আমার আগুনের অঞ্জলি?
সখা বলে সে কি বাড়াইয়া দিবে লুব্ধ শিখার কর?
ললাটবহ্নি বহিয়া আনিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বর?
ব্রহ্মাণ্ডের দাহন-গর্বে গরবী করিবে মোরে?
এই ধরণীর পঙ্কপিণ্ড নিম্নে থাকিবে পড়ে?
আজও কি রাখিব আশা?
যে মহামরুরে ভালোবাসি আমি, পাব তার ভালোবাসা?
বন্ধু হাসিছ তুমি,—
ভালোবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি?
খুব খাঁটি কথা, গাহি তবে আমি—আনন্দ কি আনন্দ,
রাতের চন্দ্রে গ্রহণ লাগিতে দিনের আফিস বন্ধ!

কচি ডাব

'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব?'
আমার বাসার ধারে
হাঁকে বৃদ্ধ ঝাঁকা ঘাড়ে,
সে পথে তখন লোকাভাব।

অঘ্রানের শীত-সন্ধ্যা
শ্বাসরোধী ধূম্রগন্ধা
চাপিয়াছে শহরের বুকে,
হিমাঙ্গ উত্তর-বায়
হাঁপের টানের প্রায়
থেকে-থেকে গলিটায় ফুঁকে।

হাঁকে বৃদ্ধ 'ডাব, কচি ডাব?'
পাগল! আজি এ সাঁঝে

সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব ;—
সেইখানে এই শীতে
কি বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব?

কাঁদিয়া কহিল বুড়া—
'তুমি মোর বাপ-খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা
মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও।'

বাহিরিয়া দ্বার খুলি
দু-হাত ঝাঁকায় তুলি
নামাইয়া দিনু তার ভার ;
বসে পড়ি ভাঙা ধাপে
থরথর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

ক্ষণেক নীরব থাকি
ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি
কহে বৃদ্ধ—তবে বাবু যাই ;—
ডাব কটি নামাইয়া
ন্যায্য দাম হাতে দিয়া
আমি তার মুখপানে চাই।

গণ্ড ভরি আঁখি-নীরে
খালি ঝাঁকা তুলি শিরে
গলি বেয়ে চলি গেল বুড়া,—
ঘরে ঢুকি দ্বার রুধি
অন্ধকারে চক্ষু মুদি
কোলে তুলে নিয়ে তানপুরা,

বেসুরে ধরিনু গান,—
হায়, হত ভগবান!
মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ!
অপরের কাব্যভালে

মিলাও তো কালে-কালে
        অনুকূল কত-না সুযোগ!

সে-সব কবির বেলা,—
শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
        দুয়ারে তরুণী পসারিনী,
তনুদেহে সিক্ত বাস,
নয়নে মিনতি-ফাঁস,
        ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।

আরো ভাগ্যবান যিনি
আসে তাঁর পসারিনী
        কোমল-করুণ-ক্লান্তকায়,
'শয্যা শুভ্রফেনিভ
স্বহস্তে পাতিয়া দিব'
        সাধে কবি সমবেদনায়।

এ ভালে তেঁতুল-গোলা—
অতি বৃদ্ধ ডাবওলা!
        তাও নহে বৈশাখী দু'পরে ;
মিটাতে প্রাক্তন দেনা
শীতরাত্রে ডাব কেনা!
        তাই কি কাটারি আছে ঘরে?

সহসা ঝনাক্-ঝান্
তানপুরে কাটে তান,
        ছিঁড়ে গেল সবকটা তার ;
আমার শ্রবণ-মূলে
অকস্মাৎ গেল দুলে
        কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার!

দারুণ শীতের সাঁঝ,
হে আমার নটরাজ,
        কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে?
অশ্রুর সাগরমন্থ
হে আমার নীলকণ্ঠ!
        ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে।

তোমরা প্রসাদকামী
স্বগৃহে সন্ন্যাসী আমি,
এ-জীবন নিষ্ফলে সফল—
অনাদি দুঃখের স্রোতে
তোমারি নয়ন হতে
ঝরে-পড়া একফোঁটা জল।

প্রেম-পিঞ্জর

তোমারি প্রেম হতে মুক্তি মাগি আমি,
হে চিরনির্মম হে মম প্রিয়তম!
মরণ-আহতের তৃষিত কণ্ঠের
তাতল সৈকতে বিন্দু-বারিসম!

যে-প্রেম আজীবন বাড়াল ক্রন্দন,
পরাল নিতি-নিতি নূতন বন্ধন,
সে-প্রেম দুঃসহ লহগো ফিরে লহ
এ তব ব্যথিতায় ক্ষম গো আজি ক্ষম ;
হে মোর প্রাণাধিক হে মম প্রিয়তম।

কঠিন কনকের সুঠাম পিঞ্জর,
দুয়ার রুধি তার পালিছ পোষা পাখি,
তোমার সোহাগের পরশ পেতে তার
চঞ্চু চঞ্চল রক্তে মাখামাখি।

মিটে তো ক্ষুধা-তৃষা নিত্য নিয়মিত,
শতেক উপচারে সতত উপচিত,
বসিয়া হেম-দাঁড়ে,—আকাশ তবু তারে
খাঁচার পরপারে করে যে ডাকাডাকি ;
মুক্তি মাগে তাই তোমার পোষা পাখি।

জানে সে জানে তার আকাশ দুর্লভ,
তোমারি স্নেহে তার বদ্ধ পাখাদুটি,
যা কিছু গৌরব হারাবে সে যে সব
তোমার খাঁচা হতে যদি বা মিলে ছুটি।

শীতাতপে দিগম্বর,
দিশাহীন পথচর,
    দেহ টলে ক্ষুধার নেশায় ;
অন্তর-শ্মশানে চিতা
সারি-সারি নির্বাপিতা,
    তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা,
শিরায় ফণীর জ্বালা,
    গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।
কৃষ্ণাচতুর্দশী-শেষে
তোমারি ললাটে এসে
    অস্ত গেছে শেষ শশীকলা!

তোমার মথার ভার,
ধরেছি যে একবার,
    তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।
দিয়েছি তামার চাকি,—
সে মোর হয়নি ফাঁকি,
    সোনায় ঘটিত অপরাধ।

যে মোহিনী স্বর্ণটাটে
পাতে-পাতে সুধা বাঁটে,
    সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ,
নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
    আমি যে তাদেরি একজনা।

তাই তুমি নানা ছলে
আমার অন্তরতলে,
    আমার দুয়ারে-আঙিনায়
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আস,
কাঁদি বলে ভালোবাস,
    মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।

উড়িতে গিয়ে শুধু তোমার গৃহশেষে
পথের ধূলিতলে অবশে লুটাবে সে,
আকাশ কোথা হায়! মরণ-মুখে চায়,

অজানা পথিকার ভিজায়ে আঁখিদুটি
তোমার প্রিয় পাখি মরিবে পথে লুটি।

বহিয়া মূকবাণী শূন্য খাঁচাখানি
দুলিবে দ্বারে তব উদাস বায়ুভরে,
বন্দী বন্ধুর শোণিত-বিন্দুর
চিহ্ন আঁকা তারি কনক-পঞ্জরে।

কত যে ব্যথা পাবে সে কথা জানি-জানি,
লুকায়ে গৃহছায়ে কাঁদিবে মানি-মানি,
তবুও মাগি তোমা এ প্রেমে দাও ক্ষমা,
পাখিরে রাখিওনা সোনার পিঞ্জরে।
না হয় খাঁচা শুধু দুলিবে বায়ুভরে।

জান কি বন্ধুয়া রতন সোনা দিয়া
যতনে রচা এই খাঁচাটি মনোহর
আমার আঁখিশেষে সুদূর নীলদেশে
ছায়ায় এঁকেছে সে কি মহাপিঞ্জর!

খাঁচার ফাঁকে আঁখি আকাশে যত চায়
নীলিমা ভরে গেছে কনক-শলাকায়।
কি ফল হল কবি, তোমার প্রেম লভি
আকাশও হল যদি খাঁচারই সহোদর?
বাঁধন-ক্লান্তিতে কাঁদে যে অন্তর।

হে চিরনির্মম হে মম প্রিয়তম,
সোনার পিঞ্জরে দুয়ার খুলে দাও,
শেষের সোহাগের পরশ বুলাইয়ে
বাহুতে দুলাইয়ে আকাশে তুলে দাও।

বদ্ধ পাখাদুটি ঝাপটি প্রাণপণ,
ছাড়িয়া যাই বঁধু তোমারি অঙ্গন,—
যা চাই নাই পাব, এবার দেখে যাব
বাঁধন খুলে কূলে কেমনে ডুবে 'নাও'।
বন্দী বন্ধুরে আকাশে তুলে দাও।

মুক্তি দাও আজি হে মম প্রিয়তম!
মরণ-আহতের তৃষিত কণ্ঠের
তাতল সৈকতে বিন্দু-বারিসম!

জংশন স্টেশনে

মাঘের প্রভাত
উষাস্নান সারি ছাড়িছে কুহেলি-শাড়ি
পূর্বানদীতটে। চম্পাপীত ক্ষণ-নগ্নবুকে
ঘুরায়ে জড়ায়ে নিল জরির আঁচল,
স্মিতমুখে চলে গেল
আলোকের অন্তরাল-পথে।
ট্রেন মোর থামিল স্টেশনে,—
জংশন স্টেশন,—
ছাড়িয়া রাতের গদি স্প্রীংময় কোমল,
নামিনু উপলকীর্ণ সুদীর্ঘ অঙ্গনে!
বিনিদ্র রাতের সাথী
গদিকে কি বেসেছিনু ভালো?
দুর্ঘট ঘর্ঘর-ঘৃষ্ট
রজনীর লৌহপথে যেবা
গতির উৎক্ষেপ-মাঝে
স্থিতির আরাম দিল মোরে,
ব্যথা কি বাজিছে বুকে ছাড়িতে তাহারে?
অথবা—
লাগিছে ভালো নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে
যাত্রীময় জংশন স্টেশনে
কঠিন কঙ্করকীর্ণ এ অপরিচয়?
প্রাঙ্গণের কাঁটাতারে কুসুমাক্ত বিদেশিনী লতা।
অদূর প্রান্তর অজানায়.
নৃত্যপর নটেশের ডম্বরুর মতো—
চলেছে সাঁওতালী মেয়ে নাচিয়া-গাহিয়া
দোলায়ে কঠিন তনু মুঠিম কটিতে।
উষাস্নাত মাঘের প্রভাত,
গদিআঁটা ট্রেনের কামরা,
কাঁটাতারে কুসুমাক্ত লতা,
মাঠের সাঁওতালী মেয়ে,
কারে আমি ভালোবাসি?
ভালো কি বেসেছি কভু কারে?
বিশ্বমাঝে কে আমার লভিল সে-প্রেম?
যে-প্রেমের

নাহি অন্ত, তল, সীমা, আদি ও ইত্যাদি?
সে-প্রেম কি কৃপণের মতো
সঞ্চয়ি রাখিনু নিজে বুকে?

দিক্‌হস্তী-সম গর্জিয়া আসিল ট্রেন ;
থামি কিছুক্ষণ
শুণ্ডমুখে আকণ্ঠ করিল পান
পঙ্কিল সলিল।
ঘড়ির কাঁটায় কহে
এ ট্রেন আমার নহে।
আমার ট্রেনের বার্তা নিঃশব্দ সঙ্কেতে,
হয়তো বহিয়া আসে তড়িতের তার!
সে বার্তা জানে না ওই নীলকণ্ঠ পাখি
তারে বসি খেতেছে যে দোলা
পরম আরামে।

জংশন স্টেশনে
ওয়েটিংরুমে দেওয়ালে মুকুর আঁটা ;
কত-কত প্রতিচ্ছবি ধরেছে সে বুকে!
চাহি তার পানে
ভাবিলাম—
যারা-যারা এল-গেল
প্রতিবিম্ব ফেলে গেল
আয়তলোচনা বিলাসিনী,
তারা যদি আজ
ভিড় করে দাঁড়ায় সম্মুখে
কারে বিলাইয়ে দিব আমার সে-প্রেম?

সহসা সম্মুখে দেখি,—
মুকুর হইতে মোর মুখপানে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে সে রয়েছে একাকী,
যারে আমি আজনম ভালোবাসিতেছি
না বুঝিয়া না জানিয়া!
ওই তনু মম,
কখন প্রথম পেনু তারে—
জননীর জঠর-আঁধারে,
নাহি পড়ে মনে।

অনালোক বায়ুশূন্য ক্লেদক্লিন্ন
জটিল অরণ্যমাঝে সুদীর্ঘ রজনী,
সেথা মোরা ফিরিতেছি খুঁজি পরস্পরে।
সহসা পরশে অনুভবি,
অন্ধ অনুরাগে
জড়ায়ে সে দিল কণ্ঠে মোর
সহস্র স্নায়ুর জালে রচিত জীবনমাল্য।
সেই ক্ষণে
বুকে বুক মুখে মুখ
লভিলাম চিরপরিচয়।

সেই হতে উভয়ের যাত্রা শুরু হল
সুদীর্ঘ পথের!
শৈশবে খেলিনু একসাথে,
যৌবনের প্রগাঢ় মিলনে
ভুলে গেনু—কেবা সে, কে আমি
আজ মোরা অভিন্ন এমন এহেন তন্ময়,
নিঃসাড় হইয়া গেছে প্রেম-অনুভূতি।
রূপহীন পিপাসিতে দিয়াছে সে রূপ,—
অজীবনে দিয়াছে জীবন,
তাই কি এমন ভালোবাসি?
জানি আমি—নহে সে সুন্দর,
তবু মানিনা তো,—তা হতে সুন্দর কারে।
শয়নে, স্বপনে, সুপ্তি-জাগরণে,
তিলেক ছাড়িলে নাহি বাঁচি।
মৃত্যুময় জানিয়াও
প্রেম মোর অমর করিতে তারে চাহে।
কালো অঙ্গে তার—
সযতনে বুলাইয়া ভালোবাসা
চিরকাল করি প্রসাধন।
লুকায়ে-লুকায়ে দেখি তারে
গুরুজন-গঞ্জনা ভাবিয়া।
তার রোগে রুগ্‌ণ আমি,
তার শোকে আমি মুহ্যমান।
হেন অপ্রমিত প্রেমে কে কোথা প্রেমিক?

ওই যুগ্ম আঁখি—
দেখাইল মোরে

রূপের স্বরূপ বারে-বারে।
বয়সের ক্লান্তি-ভারে সে যদি আজিকে
খসিয়া বসিয়া যায়
গ্রামান্ত-প্রান্তরে গরিবের গোরের মতন,
তবে কি তাহারে ছাড়ি ঘুরিয়া মরিব
পদ্মপলাশিনীদের পিছে-পিছে?
সে প্রেম মোদের নহে।
এ প্রেম এমনই মূঢ়, নিজে অন্ধ হয়ে
অন্ধে করে দিব্যচক্ষুষ্মান ;
এমনই মহান—
আপনার গোপন যৌবনে
জরারে ভূষিত করে ;
চিরসুন্দরের পাশে
কুৎসিতের রচি দেয় স্থান।
অপ্রমেয় মোদের এ প্রেম।

তবু দু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি।
এই যে জীবনরাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি
কাটাই দুজনে
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,—
এ রজনী হবে ভোর।
মোদের মিলিত কণ্ঠে আকুল মিনতি,
কাতর ক্রন্দন,
অসহ্য যন্ত্রণাময় ছেদন-বেদন,
রুধিতে নারিবে হায় অরুণ মরণরথ।
সে রথের চক্রতলে
হতমান-গতপ্রাণ প্রিয়া
যদি পড়ে রয় ধূলিধূসরিত,
চৌদিকে কাঁদিতে থাকে জীবনসঙ্গিনীগণ,
তবু রথে চড়ি
একা মোরে যেতে হবে
ওপারের মধুপুরে?
মোর প্রেম কখনো তো মানেনি মথুরা।

তার চেয়ে—
শঙ্করের মতো সতীদেহ স্কন্ধে তুলি লব,
ভ্রমিয়া বেড়াব ত্রিভুবন

মহাশোকে অসীম নির্বেদে,
যতদিন দিকে-দিকে সতীপীঠ নহে প্রতিষ্ঠিত,
যতদিন ক্রন্দনতপস্যা মম
সে-সতীরে না পারে ফিরাতে।
দারুণ সে যজ্ঞপশুদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

ঘণ্টা বাজে জংশন স্টেশনে।
আমারি ঈপ্সিত ট্রেন
আসিয়া দাঁড়াল প্রাঙ্গণের প্রান্ত ঘেঁষি।
চড়িনু নূতন ট্রেনে, নব কামরায় ;
কুশন-কবোষ্ণ গদি স্প্রীংময় কোমল।
উড়ে গেছে নীলকণ্ঠ পাখি,—
কে জানে চলিছে কিনা শূন্য তার-তলে
আমারি ট্রেনের বার্তা অগ্রিম স্টেশনে।

বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮

মেঘচাপা পূর্ণিমা,
আর সারি-সারি মুখঢাকা রুদ্যমান আলোয়
শহরের নিষ্প্রদীপ রাত শ্রাবণ-সমাচ্ছন্ন।
আলো নিবল,
রাত কাটল,
পূর্ণিমা ছাড়ল,
কিন্তু প্রভাতের কপালে
আজ আর সূর্য উঠল না।
এম্‌নি দিনেই,
এম্‌নি শ্রাবণঘন গহন মোহে,—
কাননভূমি যখন কূজনহীন,
সকলের ঘরে যখন দুয়ার দেওয়া,—
একেলা পথিক গোপন তার চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরবে পথ চলে।

শহরে তা অশোভন,
শহরে তা অসম্ভব।
পথিকের বাঁধাপথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে—
কলুটোলা স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট,
কর্নওয়ালিস স্ট্রিট হয়ে
পথিক যাবে।
তারই একটা মোড়ে—
সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।
দূর হতে কানে আসছে—
বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!
সহসা দেখা গেল—
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ।
মনে হল—

কি বিচিত্র শোভা তোমার—
কি বিচিত্র সাজ!

জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া-জোড়া জোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হয়ে
টানছে সেই যান।
টলছে যত তাদের পা,
দুলছে ততো রথের বিজয়কেতু!
হায় রে! যেন—
লটপট করে বাঘছাল,
যেন—
বৃষ রহি-রহি গরজে!
বাঁধাপথে অগণ্য নগণ্যের জনতা ;
তারই বুক দ্বিধা করে
সিধা চলেছে মৃত্যুস্যন্দন
তার কলুটোলা স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট,
কর্নওয়ালিস স্ট্রিট পার হয়ে।

সেই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে
পলকের জন্য তুমি কাছে এলে বন্ধু!
পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ!
মরণের অভিনন্দনে
সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু!
মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস
বুকের পাটায় ঘষে-ঘষে
উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন,
তাতেই হল তোমাব ললাট অভিলিপ্ত।
তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস করে
ফুটে উঠেছে যে ফুল,—
তাতেই রচিত হল তোমার মাল্য!
করজোড়ে, নতশিরে, প্রণাম করে বললাম—
বিদায় ; বন্ধু ; বিদায়!
মরণের হাতের লীলাকমল, তুমি,
চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে-তরঙ্গে,
সদ্যছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতোই ভেসে
শোকের বার্‌দরিয়ায়,
অগণিত নগণনীয়ের নাগালের বাইরে।

পরম অভিমানে তারা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছে
তাদের নিষ্ফলা ফুল।
আমি ফুল দিইনি বন্ধু,
আমার পথে ফুলের দোকান পড়ে না।

আমি বলতে এসেছিলাম—
হৃদয়বন্ধু, শোনো গো বন্ধু মোর
কিন্তু তুমি তখন
আমার কথার বাইরে চলে গেছ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মতো চুপি-চুপি ঘরে ফিরছি।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু হতে-হতে আর শোনা যাচ্ছে না।
শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে।
আর সাথে-সাথে
রিক্‌শওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—
কি বিচিত্র শোভা তোমার,
কি বিচিত্র সাজ!

রোগশয্যায়

স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায়ে অশ্বত্থশাখা আমার এপারে।
জ্বরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
লাগে তন্দ্রা, লাগে জাগরণ,
জীর্ণ-গৃহ, মুক্ত বাতায়ন,
চেয়ে-চেয়ে দেখি—
বসুন্ধরা
আকাশে ফিরিছে ফেরি করি
রোগ-শোক-দৈন্যের পশরা।

ভাঙে তন্দ্রা।
ওপারে ভেঙে বাঁধ, ঢুকে বন্যাজল ;
পক্বপ্রায় আউশের সাথে

সদ্যরোয়া আমনের ক্ষেত
হয়েছে নিতল।
ডোঙা চলে পাটের ডগায়।
কান পেতে শারদ হাওয়ায়
শোনা যায়,—
কৃষকের ঘরে-ঘরে নিরাশ নিশ্বাস,
অবশ্যম্ভাবী উপবাস।
ঘরে-ঘরে ধসি পড়ে মাটির দেওয়াল,
হুম্‌ড়িয়া পড়ে চাল,
উলঙ্গ ছেলের দল
বাঁশবনে কাটিছে সাঁতার,
পথে-পথে পশেছে পাথার।

এপারে সমুচ্চ পাড় কোলে-কোলে জল,
স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা,
জ্বরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
পল্লীপ্রান্তে দ্বিতলের জীর্ণ বাতায়ন,
নীলাকাশ খণ্ড-খণ্ড পাণ্ডু মেঘ,
ঘুরে-ঘুরে উড়িছে শকুন,
কুরে-কুরে কাঠের চৌকাঠ
বাসা গড়ে চিক্কণ ভ্রমর,
সহসা উড়িয়া যায় দারুণ নির্বেদে,
ঘুরে আসে অদূর ওদের ছাদে
শুকায় যেখানে—
শিউলির বোঁটা, কমলার খোসা,
কুলোভরা পোকাধরা কুল,
মলিন মট্‌কা থান, ভিজে নীলাম্বরী।
আকাশে শুকায় চুল
অপ্রাপ্য প্রেয়সী।
উঠে বসি—
মাথায় ঠেকিতে পড়ে পাড় ;
চাহি পাশে,—
হৃতহাসি আমার শ্রেয়সী
ঢেলেছে কাচের গ্লাসে ডাক্তারি দাওয়াই
খাওয়াই তা চাই।

ফাটা প্লেটে দাড়িম্ব বিদরে,
থরে-থরে
রসপাণ্ডু জ্বরগন্ধী দানা,
কোসো পেয়ারার কুচি
যদি রুচি ফিরে।
পেটে মৃত্যুঞ্জয়ী শূল
থেকে-থেকে করিছে উল্লাস,
হৃদয়ে হৃল্লাস চলে,
চিত্তে উপবাস ;
চাবিবন্ধ খালি বাক্সে চাপা উপহাস।
ডাক্তারি দাওয়াই
খাওয়াই তা চাই।

কেঁদে চলে গেল কানা মেঘ
আকাশ-প্রান্তরে
পুবে উবে গেল রামধনু,
ডুবে সূর্য রঙিন পশ্চিমে।
সন্ধ্যার আঁধারে
চিত্তমাঝে উঠে ধোঁয়াইয়া
হারানো পুরানো মুখ বিস্মৃতি-বিকৃতি,
ফুরানো দুঃখের যত অম্লমধু স্মৃতি।

ঘণ্টা উঠে বাজি
গৃহদেব শালগ্রাম লভে নিত্যপূজা।
উদ্দেশে নোয়াতে মাথা, দেখিলাম,
ঠিকই দেখিলাম,—
পিতামহ-পিতামহী নবীন দম্পতি
চেলাঞ্চলে গ্রন্থিবাঁধা
করিছে প্রণাম,—
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
পলক পালটি মুছি কপালের ঘাম
দেখিলাম, ঠিকই দেখিলাম,—
কাশী-গয়া-বৈদ্যনাথধাম,
তীর্থঙ্কর প্রপিতামহের
অন্তিম জাহ্নবী-যাত্রা, পূর্ণমনস্কাম,
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।

ঘণ্টা উঠে বাজি
উঠে বাজি—
পূর্ব-পূর্ব পুরুষে-পুরুষে
যত জন্ম, যত মৃত্যু, উৎসব, ব্যসন,
শান্তি-সস্ত্যয়ন,
ভবতু শতায়ুঃ সপ্তপদী, লাজ বরিষণ,
মধুবাতা ঋতায়তে,—
তারি মাঝে অক্ষুণ্ণ-অম্লান
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।

মানুষের গৃহের দেবতা
তাই হওয়া চাই,—
গণ্ডকীর খর স্রোতে গড়াতে-গড়াতে
অনয়ন-অশ্রবণ হস্তপদ নাই,
শিলায় শিলিত বুক বজ্রকীটবিদ্ধ,
তাই হাওয়া চাই।

তবু কেন
সে-দেবতা সে-মানুষে সে-ধরণী ছেড়ে
চলে যেতে হবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই?
মনে হয়—সবই ভালোবাসি,
নহে শুধু আলো, শুধু হাসি ;
অন্তরে-অন্তরে
বাস করে দীর্ঘ উপবাসী
যে লীলাবিলাসী,
সে আমার—
রোগ-শোক-দৈন্যেরও পিয়াসী।

রোগ তবে রোগ নয়?
শোক নহে শোক?
দৈন্য সে কথার কথা তবে?
এত যে যন্ত্রণা—
এ-সবই নেপথ্যবাসী আমারি মন্ত্রণা?

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায়-তারায়।

বনপ্রস্থ

চলেছিনু শাল-জঙ্গল পরিদর্শনে ;—
দুর্গম পথ দুর্গমতর কালবৈশাখী বর্ষণে।
থেকে-থেকে দেয়া চমকায় ;
আর মাঝে-মাঝে বাজ ধমকায়
কালো তুরঙ্গে অকাল সন্ধ্যা
পথ খুঁজে ফিরে শাল বনে,
যেথা গজারু গড়ের সঙ্কটা বুড়ি
শত শঙ্কার জাল বোনে,
সেই শালবনে, দূর শালবনে।

দুর্যোগঘন রাত্রিযাপন
নির্জন বনবাংলায় ;
নিম্নে পাহাড়ি নামহারা নদী
বাঁকে-বাঁকে টাল সামলায়।
জল কেন হোথা ছলকায়?
বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায়?
সুদূরে তরুণী গারোনীর ডাকে
পথহারা গাভী হামলায়।
আনন্দমঠী সন্ন্যাসীদল জাগিয়া
যেন ভাঙা মন্দির নির্মাণে-গেল লাগিয়া,
উঠে কল-কল-কল হুম্‌কার,
বলো নির্জন বনবাংলায় আসে,
ঘুম কার?

হায় নিদ্রাবিহীন স্বপন আমার
টুটিবে কাল,
শ্যামবনশাখে ঝড় বৈশাখী
হবে সকাল!
কালো মলাটের মোটা-মোটা খাতা,
উলটিয়া যাবো রুলটানা পাতা,
হায়রে হায়,—
মিলাব যে সব সূক্ষ্ম হিসাব
লিখিত তায়।
যত গাছ আছে গোনা হল কি না?
লেখা হয়েছে তো সঠিক ঠিকানা।

নক্‌শা হল কি সীমানা এঁটে?
ক নম্বরের কোন শালতরু
ক ফুট লম্বা, মোটা ও বেঁটে!
বিনা পাসে কেউ ঘাস কেটে বনে
দিল কি ফাঁকি?
ডাল ভেঙেছিল জরিমানা তার
এখনও বাকি!
হায় রে হায়,—
আজি রজনীর স্বপ্নশঙ্কামোহঘন এই
নির্জন বনবাংলায়
কল্য প্রভাত ভরিয়া উঠিবে
আমলায় আর মামলায়!

কোথা বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ,
কোথা রামসীতা, গুহক মিতা।
বনে আসিলাম, সাথে-সাথে এল
খাতা ও ফিতা।
কোথা কাম্যক-হিড়িম্বা-বক
কোথা দণ্ডক শূর্পণখা!
কোথা মায়ামৃগ, ছিন্নপক্ষ পিতৃসখা?
স্ফটিক ফিরানো চলনদী-জলে
জপময় কোথা তপোবন!
হোম-ধূমাঙ্কী সাম-ওম্‌কৃত
জটিল বটের ছায়াসন?
ফুল-পল্লব-মঞ্জরী-ময়ী
আশ্রম সঞ্চারিণীরা কই?
যতনপিহিত বল্কালা বালা?
হলা পিয়া সখী? কোথা বা কণ্ব?
অরণ্য হায় দারুভূত আজ
বনবিভাগের বিপণি-পণ্য।
হায়রে-হায়,—
বনবাসে এসে সই করে চলি
বাঁধা খাতায়।
শুধু কাঠ, আর কিউবিক্ তার,
মেপে মরি বেধ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,
মনে মন নাই,—বনে বন নাই
ঘটিল না তাই বানপ্রস্থ!

পঞ্চাশোর্ধ ক্ষুব্ধ জীবন
টেনে নিয়ে ফিরি গৃহাভিমুখে ;
ঘরের দুঃখ এল যদি বনে,
বনে আসি তবে কিসের সুখে?
তবু,
কালি রজনীতে স্বপ্নশঙ্কাসম্মোহঘন
নির্জন বনবাংলায়
আমি হেরেছিনু কোন্ শিখরচারিণী
বাঁকে-বাঁকে টাল সামলায়!
আর শুনেছিনু কোন্ বনঘরণীর
হারা গাভী দূরে হামলায়!
ঘোর ঘনাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাপন্ন
গহনারণ্য বাংলায়।

ভিখারিণী

ওগো ভিখারিণী, দেখি আয়,
কী মিলেছে আজি ভিক্ষায়।
কত চাল, মরি-মরি,
চলেছ ঝুলিতে ভরি
এ-গাঁ হতে অন্য কোন্ গাঁয়!

এ কি হায় দেখি ভিখারিণী,
কাঁধে তো ঝুলিটা নাই।
কে বুঝি সুযোগ পাই'
একা পথে নিল তাহা ছিনি?
কেন তোর আঁখি ছলছল?
এখনি আপনি গিয়ে
থানায় খবর দিয়ে ;—
কী হয়েছ মোরে খুলে বল্।
হায় ভাগ্য, ছিন্ন সেই ঝুলি
করেছিস বুকের কাঁচুলি!
রাখিতে লাজের মান
ঝুলিটায় দিলি টান,
উদরের কথা গেলি ভুলি?

ভিক্ষা চাস, কাঁধে ঝুলি নাই,
দান যে দাঁড়াবে—কোথা ঠাঁই?
দ্বারে-দ্বারে মুঠো-মুঠো
দাক্ষিণ্যে করিলি টুঁটো,
বালাইয়ের উপর বালাই।

ভিখারিণী কারে তোর লাজ?
গিঁঠায়ে রাজ্যের কানি
ঢাকিয়া যৌবন-গ্লানি
নিরন্ন ফিরিছ পথে আজ।
ক্ষুধায় ছিঁড়িছে নাড়ি ;
তবু জেগে বসে নারী
রক্ষা করে মানব-সমাজ।

মানবের লজ্জা আছে নারী?
পট্ট-বাসে দেহ ঘেরা
পাটনাই পেঁয়াজেরা
তোরে হেরে ফেলে অশ্রুবারি!

ভিখারিণী, কথা রাখ্
বিবসনা হয়ে থাক্
যতদিন অন্ধ নহি মোরা।
কারে লাজ, কোন্ ভয়?
তনু তোর গোরা নয়,
নাহি তার কনক-কটোরা।
তোরি মতো কালো মেয়ে,
রূপসী বা তোরও চেয়ে,—
হয়তো এমনি কোনো দুখে
ফেলিয়া কটির বাস
হেসে উঠে অট্টহাস
পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে।

তখন বিশ্বের লোক
চমকি মেলিয়া চোখ
আনে পূজা শত-উপচার ;
বলে—এ কি রূপরাশি
তিমিরে তিমির-নাশী!
দয়াময়ী তুমি মা আমার।

শুনে কালো মেয়ে হাসে,
ভুবন ভরিয়া ত্রাসে
তাথৈ-তাথৈ নেচে ধায় ;
কপালের দুখ যত
অনল-গিরির মতো
কপাল ভাঙিয়া বাহিরায়।

দল-মল নৃত্য-ভরে
মালা ছিঁড়ে মুণ্ড পড়ে,
হান অসি মাভৈঃ-মাভৈঃ।
দু-কানে দোদুল সুখে
কচি শিশু মরা মুখে
মার বুকে দুধ খোঁজে ওই।

মানুষের হাত কাটি
ঘাঘরা পরেছে আঁটি
কটির মিটিল বুঝি ক্ষোভ ;
'ভুখা হুঁ' 'ভুখা হুঁ' বলে
খর্পর মুখে তোলে,
যত খায় ততো বাড়ে লোভ।

ভিখারিণী, কথা শোন—
তুই যে রে তারি বোন,
প্রলয়ের জানিস সন্ধান।
ফেলে দে ফেলে দে টানি
ঘৃণ্য ওই চীরখানি,
ও-সাজ নারীর অপমান।

দেহান্তরিত

পরপার হতে অপর পারের কথা—
যে-নদীর ঘাট নেই, খেয়া নেই, সেতু নেই,
সেই নদীর পারাপারের কথা।
দুস্তর নিস্তরঙ্গ খরস্রোত,
আর স্তরে-স্তরে চোরাবালি ;

অকল্লোলিনী অতলস্পর্শিনী কালিন্দী
অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,—
ডুব-সাঁতারে পার হয়ে এলাম।
সেই রুদ্ধশ্বাস অগাধ নিশীথ-সঞ্চরণ,
সেই নিশিতে-পাওয়া অকূল স্বপ্ন-সঞ্চরণ!
সে আর আমি, ঐকম্বিক দেহ আর প্রাণ,
মেঘমতী নদীতে ডুব-সাঁতার।
গতপ্রাণ লঘু দেহ ভাঁটিয়ে ভেসে চলে গেল দক্ষিণে,
হৃততনু মুক্তপ্রাণ
উজানে ডুব দিয়ে—
সাঁতরে উঠল উত্তরে।
সেই সদ্য-পাওয়া পরপারের চোরাবালি হতে
অপর-পারকে আহ্বান করছি, আকুল হয়ে ডাকছি,
অকূলে ভেসে যাওয়া হে আমার দেহ,
অবসান হল কত যুগ,
প্রাণ দিল কত প্রাণ,
তোমায় কি কেউ বাঁধতে পারে না?
হে আমার প্রিয়, হে আমার অন্ধের নয়ন,
বধিরের শ্রবণ, তৃষিতের কণ্ঠ,
এস-এস ফিরে এস!
আমার এই পরপারের ক্রন্দন
অপর-পারের চোরাবালির চরে ঠেকে
হাহাকার করে উঠল।
মনে হল, সেখানে সেও কাঁদছে।
কেঁদে-কেঁদে সে মাটি হল,
আপন অশ্রুতে গলে জল হল,
ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ফুরিয়ে গেল তার বুকের হাওয়া,
জ্বলে-জ্বলে জুড়িয়ে গেল তার পাঁজরার আগুন,
অসীম আকাশে নিবে এল তার
ক্লান্ত করের পঞ্চপ্রদীপে
পাণ্ডুশিখার থরকম্পন,
নিভে গেল শ্রাবণ-রাতের
যুথিকুঞ্জে বর্ষণ-ক্ষত খদ্যোতিকা।
তবুও উত্তর হতে শুনছি দক্ষিণের কণ্ঠহীন কাঁদন।
সে আমার কেঁদে-কেঁদে ডাকছে, এস-এস,

হে আমার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠের সংগীত ;
সারা আকাশে আজ তোমার চেয়ে
উড়ছে আমার অন্বেষণের আঁচল ;
ধরা দাও, ধরা দাও,—
ব্যর্থ করে যেওনা—
কত যুগ-যুগান্তের চুপে-চুপে সুদীর্ঘ আয়োজন,
ছিন্ন করে যেওনা—
কত দেহ্-দেহান্তের রূপে-রূপে সহস্র বন্ধন।
হে আমার প্রিয়তম ;
এস-এস ধরা দাও।
অপর-পারের সেই আকুল ক্রন্দন আছড়ে পড়ছে আমার কূলে।
উত্তাল হয়ে উঠল চৈতন্যসাগর,
উদ্দাম হয়ে এল মহান প্রাণ-ঝঞ্ঝা ;
তলিয়ে যাচ্ছে আমার ভার,
ভেসে যাচ্ছে আমার বুদ্বুদ,
অথই চৈতন্যে অচেতন হয়ে এল আমার চেতনা।
এপারে ফুরিয়ে গেলাম আমি,
ওপারে জুড়িয়ে গেল সে।
মাঝে বইছে অকল্লোলিনী অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,
আর তাতেই খেয়া দিচ্ছে পারাপারের ক্রন্দন।
কাঁদছে পরপার ;—
আবার কবে কুড়িয়ে পাব
ফুরিয়ে-যাওয়া আমারে,
তোমার পানে ভাসিয়ে দেব তরী?
কাঁদছে অপর-পার ;—
কবে, সে কোন্ আরাধনায়,
অতনু মোর অনুকণায়
জাগবে তীরে পঞ্চপ্রদীপ ধরি?
শাশ্বত এই মেঘমতী নদী
আর শাশ্বত এই পারাপারের ক্রন্দন ;
অসেতুকা কালিন্দীর কূলে-কূলে
কাঁদে চখা কাঁদে চখী,
বিভাবরী পোহাল,
তিমির হতে তিমিরান্তরে।

উৎসব

দৈনিক দীনতাগুচ্ছে আটি বাঁধা-বাঁধা
বৎসরে বৎসর—
শুষ্ক তৃণস্তূপ,—
তীর্ণপ্রায় পাণ্ডু ত্রি-প্রান্তর।
সহসা বিদীর্ণ করি তাম্র দিগন্তর
আসে না উৎসব কোনো?
মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ-পরশে
দাহন-হরষ আনি
ক্ষণতরে দেয় না রাঙায়ে প্রাণের আকাশ?
সমস্ত শূন্যতা
সুপ্রসন্ন, করি সুপ্রকাশ?
এসো-এসো হে উৎসব!
হাসিমুখে একবার করহ আহ্বান ;—
পতিত মাঠের মাটি
দিনেকের তরে পেয়ে প্রাণ
উঠুক প্রতিমা হয়ে পূজার মণ্ডপে।
তোমারি মায়ায়
একটি রজনীতরে ঝুটা রাংতায়
উঠুক ঝলিয়া
মহামূল্য মাণিক্যখচিত
কষিতকাঞ্চনসমাদর।
বাঁশের বাঁশির রন্ধ্রে অধমের মুখে—
নহবতে উঠুক বাজিয়া—
দিব্য সুরে বুকের সানাই।
মরণান্তে প্রসাধিত
অবোলা পশুর চামড়ায়
কাড়া ও নাকাড়া ঢোল
করিয়া উঠুক কলরোল।
মণ্ডপের বদ্ধ নির্জনতা
সহসা খুলিয়া দ্বার হোক মুখরিত
গীতে-বাদ্যে-গণ্ডগোলে,
আলোক-উজ্জ্বল চন্দ্রাতপতলে
দলে-দলে জনসমাগমে।
এ-মন্দিরে একদিন

সুন্দর-সুন্দরী নবীনা-নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
গৌরবে-গরবে-অলঙ্কারে।
বালক-বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ় কি প্রৌঢ়ারা
মলিন আটপৌরে ছাড়ি
যে যার পোশাকী সাজে
একদিন সাজিয়া আসুক সারি-সারি।
বহিয়া আনুক গন্ধ, মাল্য-মাঙ্গলিক।
ভুলি নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়।
ধূপ-দীপ-শঙ্খ-ঘণ্টা,
পুষ্প-পত্র-মন্ত্র-হোম-দান,
নৃত্য-হাসি-গান,
দীয়তাম্ ভূজ্যতাম্ রব—
আনো-আনো-আনো হে উৎসব!
তারি মাঝে—
কি আত্মীয়-অনাত্মীয়ে
সসম্ভ্রমে করিয়া আহ্বান,
সুমধুর অশনে-ভাষণে
সবারে হৃদয় করি দান।
গুরু বৃদ্ধে করিয়া প্রণাম
করপুটে লভিলাম
মুক্তাসম যত আশীর্বাদ,
গাঁথি মালা, পরায়ে তরুণ-কণ্ঠে,
পূর্ণ করি অন্তরের সাধ।

কার্পণ্যকুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাঁচ্চা-পোয়া-ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব!
দিনেকের তরে
ভারে-ভারে মণে-মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর ঘরে।
অনর্জন-অসঞ্চয় ঋণ
এক পাত্রে গণি
এক রাত্রি করো মোরে ধনী,—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী-সম।

মিথ্যা করি ভাগ্যলিপি, লঙ্ঘিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
লয়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ,
কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে লাগুক ছোঁয়াচ
হাঘোরিয়া উড়নচণ্ডীর!

তারপর?
তারপর দেখিব চাহিয়া—
তোমার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ঠ ভস্ম তৃণস্তূপ,
তোমার উচ্ছ্বাসবন্যা আনন্দপ্লাবন,
গেছে ভাসি—
গেছে নামি ;—
আর—
ঘিরে চারিধার—
সংশয়-সঙ্কুল সন্ধ্যা,—
সঙ্কট-পঙ্কিল তেপান্তর!

তা হোক, তা হোক,—
দিগন্ত নিতান্ত নিরুৎসব,
একবার এসো, হে উৎসব!

চোখের জল

ও-চোখে মানাবে না চোখের জল আর।
কাঁদিয়া অপমান কোরো না বেদনার।

নাই সে নীলনভে বোশেখী কালো মেঘ,
নাই তো দুরু-দুরু আষাঢ়-উদ্বেগ
কোথা সে শাওনীয়া
বাতাস পূরবীয়া,
কোথা বা বিজলির ঝলক ছলনার?
ও-চোখে আনিও না চোখের জল আর।

যে-যূথী ঝরি পড়ি হারালো পরিমল
তারে কি সাজে আর শিশির ঢলোঢল।
নিদাঘ-নিপীড়নে
যে-বুক সমতল
সেথা কি ছলছলে কমল কহ্লার?
ও-বুকে ফেলিও না চোখের জল আর।

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পারে কি গো ফিরাতে মধুমাস?

নাই সে-ধূপছায়া
নাই সে-মেঘমায়া
নাই সে-গৌরব হাসি কি কান্নার।
ঊষর-ও-কপোলে বিফল জলধার

এখন বসো আসি আসনে উদাসীন,
ঘুরায়ে চলো করে সুতায় গাঁথা দিন,
শুনো না কারা হাসে
কাঁদে ও ভালোবাসে,
এখন করো শুধু জপের মালা সার।
সমুখে বহি যাক গঙ্গা খরধার।

ফেলো না ফেলো না গো বিফল আঁখিজল
কোরো না অপমান গোপন বেদনার।

মা

মা গো—
তোমার আকাশে অশীতি ঘনায়—
আমি ভেসে চলি ঘাটের টানে,
অভ্যাস-বশে মা বলে যে ডাকি
সে-ডাকের আজ আছে কি মানে?

মা-নামের মাঝে যে-মধু লুকানো
সে-মধুর স্বাদ ভুলেছি কবে—
যৌবন-পারে কৈশোর-রেখা
তারও আড়ে দূর সে শৈশবে।

তখন ছিলে মা ধ্যেয়ানের ধন
একশ্চন্দ্র মানসাকাশে,
তব মুখপানে বাড়াতাম বাহু
বাঁধা রহি তব বাহুর পাশে।
তোমারি তনুর অমৃতমথিত
সদ্যোত্থিত নবনীসম
তোমারি বক্ষে ভাসিত তখন
দুর্লভতম সে-তনু মম।
ছিল সে অধরে দুধের তিয়াস
স্তন্য ছিল মা তোমার স্তনে,
কত চুমা ছিল তোমার মুখে মা
কত সুধা মোর সম্বোধনে।
তোমার হাসির অরুণ কিরণে
ফুটিল সে-মুখে প্রথম হাসি,
তোমার মুখের ঝরা মধুভাষে
হল সে কণ্ঠ কলোচ্ছ্বাসী।
ছেলে ও মায়ের সে জগৎ হতে
দুজনেই আজি নির্বাসিত,
কায়মনোবাক
মরণের আশে জীবন ভীত।

বিসর্জিতার কাঠামো প্রণমি
ভক্তিমূল্যে আশিস চাহি,
মোর মুখ চেয়ে বোঝনি কি মাতা
কতকাল তব পুত্র নাহি?

মা গো—
ছেলে ও মায়ের জগৎ হইতে
সত্য কি মোরা নির্বাসিত?
যৌবন আর শৈশব বিনা
সেথা কি সকলি অবাঞ্ছিত?
যশোদা-ম্যাডোনা-গণেশজননী
ভুবনেশ্বরী-ষোড়শী-তারা,
রূপে-যৌবনে-স্নেহে-লাবণ্যে
মহিমান্বিতা সবাই তারা।
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—
কবি গাহে গান—যে-মায়ে দেখে,

অথই মর্ত্যে মৃত্যু জিনিল
চিত্রী যে-মার চিত্র আঁকে।
যুগ-যুগ ধরি কত না শিল্পী
পাথরে ফুটালো যে-মার ছবি
শত সাধনায় বিমুক্তি পায়
ভক্ত যে-মার চরণ লভি,—
সবাই যে তারা যৌবনময়ী
কত গৌরব-গরব-ভরা,
তোমার ছেলের মায়ের মতন
নহে তো ব্যথিতা অশীতিপরা।
শুষ্কতরুর ভগ্ন শাখায়
কাঠ্‌ঠোকরার ঠোকর-সম
মায়ের মহিমা পারে কি রাখিতে
মাতৃনাম এ কণ্ঠে মম?
অরূপার রূপে মায়ের স্বরূপ
ফুটায়ে তুলি যে সে ভাষা কোথা?
কোলাহল তুলে চেতনার মূলে
ভাঙে কালিন্দী কলস্রোতা।
করধৃত তব এ ভাঙা যষ্ঠি
ভাসে নিষ্প্রভ ও-আঁখি-জলে,
ধূমাবতীসমা দুখিনী তুমি মা,
ষোড়শী-পূজা কি আমার চলে?
ভগ্ন প্রাণের যা কিছু প্রণাম
ক্লান্ত ও পায়ে নামানু সতী,
পরেব মায়েরে মা বলে ডাকিতে
জীবনে যেন মা না হয় মতি।

বকুলতলীর ঘাটে

রূপনদীতটে বকুলতলীর ঘাটে
সকাল আমার সন্ধ্যা হইয়া যায়,
সিনান সারিয়া ফিরিল যে ছায়াবাটে
সে-অপরূপার নির্মম নিরাশায়!

সোঁতের জলের স্নান-পরিচয়
পথে আঁকিলেও থাকিবার নয়,—
ছিলনা কি তার জানা?
তবু সে ফিরিল সিক্ত বসনে
আঁটি নবতনু সজল শাসনে,
গাঁথিয়া চরণ-চিহ্নের মালা,
না শুনি আমার মানা।
শতছিন্ন সে-চিহ্নের মালা,
বক্ষে শুকালো মোর—
বকুলতলীর ঘাটের পবন
বকুলগন্ধে ভোর।

চলে রূপনদী ছলকি-ছলকি
বরনে-বরনে আলোক ঝলকি
পলে-পলে শত বিম্ব ফলকি
লালস-লাস্যভরে।
চঞ্চলা নদী ফিরে বাঁকে-বাঁকে,
পুবের কামনা পশ্চিমে আঁকে,
ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে মানস-মরাল
ঘুরে নামে চরে-চরে।

বকুলতলীর ঘাটে নদীজল
স্থির ছায়াবুকে স্রোত-চঞ্চল,
সারাখন ঝরা বকুলের সাথে
ঝরা ক্ষণগুলি ভেসে যায়।
কুহু-কুহু কাঁপে সুরভি বাতাস
কাঁপে কিশলয়ে বাসন্তীবাস
গুন-গুন কাঁপে পাখার আভাস
নীল নভে কলি হেসে চায়।
মোর চোখে সবই
লাগে যে ছায়ার মালা,—
মনে হয় এ তো সবই মরীচিকা :—
অন্তরে জ্বলে অপরূপ শিখা
গভীর-শীতল-সলিলে নাহিয়া
নিবিল না যার জ্বালা।

এই রূপনদী ফেলিয়া পিছনে
যে গেল ফিরিয়া আপন নিজনে,

মুগ্ধ কবির সাধ্য-সাধনে
ফিরালো যে হেলাভরে,
নিবানো দীপের ব্যথা হয়ে জমা
যার দুটি আঁখি হল নিরুপমা,
ঝরা পাপড়ির নিতি নিবেদন
যাহার ওষ্ঠাধরে,
ফুরানো গন্ধ যার কেশপাশে
লভে চির-আশ্রয়,
হারানো কণ্ঠ যাহার মৌনে
চিরগুঞ্জনময়,
যত কিশোরীর গত কৈশোর
যে মুখের মাঝে ধেয়ান-বিভোর,—
বকুলতলীর ঘাটেতে নাহিয়া
ফিরিল সে ছায়াবাটে।
সকাল হইতে সে-অপরূপার
ধেয়ানে ঘনালো সন্ধ্যা আমার,
রূপনদীতীরে তারি নিরাশার
আশ্বাসে বেলা কাটে,
বকুলগন্ধে ভরা গো, শূন্য
বকুলতলীর ঘাটে।

কন্যাদান

টাপুর-টুপুর বৃষ্টি পড়ে উথলে উঠে বান।
কোথায় বুঝি সাঙ্গ হল তিন কন্যে দান।

তিনটি মেয়ে ঋণ শুধে যায় তিনটি কাঠা চালে,—
'বউ কথা কও' ডাকছে পাখি কনকচাঁপার ডালে।

ঝাপসা মাঠে হারিয়ে গেল অশ্রুমতির দুল,
খেয়ার ঘাটে পড়লো খসে খোঁপায় গোঁজা ফুল।

ঘোমটা লেগে খসেছে ফুল নোটন বেণী খুলে,
সোঁতে ভেসে ঠেকলো এসে ভাঙাঘাটের মূলে।

ফুলের মুখে একটি ফোঁটা চেনা মুখের হাসি,—
ধরতে গেলে ঢেউ-এর দোলে সোঁতে চলে ভাসি।

ধোরো না ধোরো না ও ফুল সোঁতের বড় টান,-
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি পড়ে—উথলে উঠে বান।

মালাবদল

ফিরতেছিলাম বাইসিকেলে শালগামুদে রোডে
চুকিয়ে পথের শালতামামি চৈতী চড়া রোদে।
বয়স তখন হবে বোধ হয় আটাশ-উনত্রিশ,
পায়ের চাপে ঘুরছে চাকা, চলছে মুখে শিস।
সূর্য তখন মাঝ-গগনে, দরদরিয়ে ঘাম,—
বুড়ো ঝাউ-এর ছিন্ন ছায়ে বাইক থামালাম।
শুধাই তারে— বয়স কত ওগো বুড়ো ঝাউ?
বুড়ো বলে— দেওয়ান তখন রামভদ্র শাউ ;
এ-তল্লাটে কুঠির সেরা শালগামুদে কুঠি,
সাহেব-সুবো পাক-পেয়াদা সদাই ছুটোছুটি।
সেলাম দিলে স্যোয়ান সাহেব দেওয়ান হল খাড়া,
মেমসাহেবের কবর ঘেঁষে লাগাও ঝাউ-এর চারা।
বয়স আমার কত হল হিসেব করো তাই,—
বড্ড কড়া রোদ হয়েছে একটু বসো ভাই!

বুড়োর কথায় ঈষৎ হেসে বাইসিকেলে উঠে
ডাকবাংলা পৌঁছে গেলাম এক কদমের ছুটে।
বুড়ো তখন ছেঁড়া ছায়া ছড়িয়ে কটি-মূলে
হাঁপের টানে টানছে পাঁজর ঊর্ধ্বে শাখা তুলে।
কথাটা তার ঠেলে আসা হয়নি আমার ভালো
হয়তো দেখা হবে না আর বাঁচবে কত কাল ও

তারপরেতে তিরিশ বাদল তিরিশ চৈতী রোদ,—
ভুলের তলে তলিয়ে গেছে বুড়োর অনুরোধ।
বিধিচক্রে চলেছি ফের শালগামুদে রোডে
হাতে লাঠি কাঁধে ছাতি পড়তি ভাদুই রোদে।

আমার চোখে পথ যেন আজ মরুর সরু ফালি,
ওই যে খাসা ঝাউতলাতে শীতলপাটির ডালি!
যৌবনেরি নেশায় তরু রৌদ্র করে পান,
সন্‌সনিয়ে আকাশ পানে সবুজ অভিযান!
ছাতা মুড়ে কোঁচার খুঁটে মুছে মাথার ঘাম
ছায়ায় বসে স্নেহের সুরে যত্নে শুধালাম—
কত বছর আছো হেথায় ওগো নবীন ঝাউ?
তরু বলে— দেওয়ান তখন রামভদ্র শাউ—
চম্‌কে উঠে, ছাতা খুলে ঠুক্‌ঠুকিয়ে লাঠি
এলাম ফিরে স্বাস্থ্যনিবাস মাড়িয়ে সকল মাটি।

যত ঘুমুই, একই স্বপন, এও তো বড় জ্বালা,
ঝাউ-এর সাথে অদল-বদল হচ্ছে গলার মালা!

সমাধান

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা,—
"প্রেম বলে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতার ঝাঁজ?
যে-হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন,
যে-পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে নহিল নির্বাপণ,
বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি,—
যে-সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয় এ-দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু—নাই,
চেতনার কূলে বসি চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।

সেই এসেছিল মোর যৌবনে বৈরাগী বেশ ধরি,
বক্ষে তাহার বেদনার হার চক্ষে অশ্রু ভরি!
হাতে একতারা গলা ধরা-ধরা গান গেয়ে সে যে কান্ত
রুক্ষ চাঁচরে ঘুরাইয়ে বাঁধা ছেঁড়া উড়ানির প্রান্ত।

ছিল না তো তার পিঠে ফুলধনু,
পীত উত্তরী-পিনদ্ধ তনু,
কোথা ফুলসাজ কোথা বীণা-বেণু?—চিনিতে পারিনি তারে।
মিলিয়া পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলা
পথে যেতে তার গায়ে দিত ধুলা ;
আউল-বাউল এ কোন্ উদাসী চলেছে ভবের পারে।

আজ পথে-পথে ধুলা ঘেঁটে মরি খুঁজে তারি পদচিহ্ন
ঘাটে-ঘাটে ডুবি,—যদি হাতে ঠ্যাকে তারি উত্তরী-ছিন্ন।
কাঁটার আঘাতে ফোঁটায়-ফোঁটায়
পথের প্রান্তে বোঁটায়-বোঁটায়
রক্ত-কুসুম যত ফুটেছিল কোথায় তাদের খুঁজি?
তারি চক্ষের দুটি জলধার
বক্ষে তাহার রচিল যে-হার
কোন্ নদীজলে খরস্রোত-তলে সে হার হারালো বুঝি।

চিরতরে হায় ঝঙ্কার-হারা
কোথা পড়ে আছে ভাঙা একতারা,
মুখর মুখের করোটির পারা কোন্ শ্মশানের কোণে?
আজি কি কাহারো ধনুকের গুণ
জাগাতে পারে না ক্ষণিক ফাগুন?
তড়িত-চকিত লাগাতে আগুন মূক কিংশুক বনে?

আজও বরষার নাহি যে অন্ত,
শীত-শঙ্কিত দ্বারে হেমন্ত,—
এ অকালে কে জাগাবে বসন্ত জীয়াতে আমার প্রেম?
পথে-পথে শুধু দিতে-নিতে দুখ
আঁখি মেলে কভু দেখিনি যে-মুখ,
পেলে ক্ষণতরে বুকে টেনে তারে আর-বার হারাতেম।

চিবুক ধরিয়া কহিতাম—ক্ষমো
সারাজীবনের অপরাধ মম,
সাথে-সাথে ছিলে সহচর-সম তবু বলেছিনু—নাই ;
বহু বিলম্বে এখন বুঝেছি—
তোমারে ঠেলিয়া তোমারে খুঁজেছি,
দূর-দুর্গমে কত যে যুঝেছি যদি তব দেখা পাই।

আজ চেতনার কুজ্ঝটি-কূলে,
নির্বাপিত এ-তব চিতামূলে
যৌবন-বেচা জরা বিনিময়ে জড়ত্ব বরিয়াছি,
কুক্ষণে কহা এ-মুখের কথা
এতকালে এ-কপালে ফলিল তা,
প্রার্থিত সেই শেষ-সমাধান আসিয়াছে কাছাকাছি।

তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই,—
উঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ,—
চেতনে ও জড়ে কাঁদে গলা ধরে,
দরদী নাহিকো কেউ।

ভাঙা-গড়া

নাচ্ ফরমাস করেছিনু বলে নেচেই চলবে ঠাকুর?
দেখবে না চেয়ে পায়ের তলায় মানুষ কি মরা কুকুর?
এক লোটা ভাঙ্ জোড়া বেলপাতা,—
এতেই তোমার বিগ্ড়ালো মাথা!
ষোড়শোপচারে পূজিতা প্রতিমা
ভাঙিলে লাথির ঘায়!
কিলিবিলি করে গোখ্রো-কেউটে,
নিশ্বাসে বায়ু বিষাইয়ে উঠে,
ভূতের-প্রেতের গায়ের গন্ধে
আপামরে বমি পায়।

ফিরে শবলোভী ভীরু ফেরুপাল,
ঘৃণ্য শকুনি টেনে ছেঁড়ে ছাল,
তারি মাঝে তুমি বেহঁস বেতাল—নাচো,
খেয়াল নেই যে কে মরে কে বাঁচে, আপনি মরো কি বাঁচো!

ছিলে কত সুন্দর,
আজ, কী দশা অরুচিকর।
কে কোথা শুনেছে নাচে যদি শিব
শৃগাল-শকুনি হয় উদ্গ্রীব?
তোমার ভিতর এমন ইতর কোথায় লুকায়ে ছিল?
নটনাথ-তরে সাজানো আসরে ভূতনাথ দেখা দিল।

তবু ভেবেছিনু,—হোক কিছু মজা
ভৈরব যদি তুলিয়াছে ধ্বজা
না হয় নূতন গাজুনে ভঙ্গি
দু-একটা নেবো শিখে ;
কে জানিত হায় তুমি একেবারে—
মঞ্চ ভাঙিয়া লাফ দেবে ঘাড়ে!
পায়ের চাপনে কত মরে কত
পলায় দিক-বিদিকে।
ভাঙিল আসর ছিঁড়ে উড়ে পাল,
এক হয়ে গেল আকাশ-পাতাল,
কে জানিত হেন বদ্ধ মাতাল
এতকাল পূজা খায়?
কাঁধে ফেলে মরা অন্নপূর্ণা
সারা ধরণীটা করো বিচূর্ণা,
যত জীয়ন্তে মরণ হানিলে
মরা কি জিয়ানো যায়?
বহুদিন গত চৈতী গাজন,
মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া-রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।

আমাদেরি সাথে চলোগো ঠাকুর ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল পাথরও যেন গো ফাটে।

ভালো লাগিত না আধমরা শিব,
তা বলে চাহিনি ক্ষ্যাপা অতিজীব
যাহার চরণ নির্বিচারণ
ছড়ায় মরণ-ঘূর্ণা।
শঙ্কর! হও সঙ্কর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা।

মোরা আছি সাথে, মাভৈঃ-মাভৈঃ,
মনে নাই সতী হে মরণজয়ী,
মিছে ভাঙনের প্রয়োজন কই,
এল গড়নের পালা,
মাঠে-মাঠে মোরা ফলাবো ফসল,
ঘাটে-ঘাটে তরী হবে চঞ্চল,
আগে বাড় ভাই কাঁধে হল, শিরে
কাস্তে চাঁদের ফালা।

দেবতা যখন পূজা পেয়ে-পেয়ে হল দানবের বাড়া,
শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব তবে ভাই পাবে ছাড়া।

শবরী

আজি মোর শুষ্ক তপোবনে,
রিক্ত শাখে দুলে শেষ ফল,
বৃন্তের একান্ত ক্লান্তিভরে
না জানি কখন খসি পড়ে,
বর্ষশেষ চৈতালির শ্বাসে
চাহিছে সে লভিতে ভূতল।
দ্বিধাভরে আশা ও নৈরাশে
বাতাসে দুলিছে শেষ ফল।

তুমি এস জীর্ণ পর্ণবাসে
এস মোর অসাধ্য-সাধন!
কত বর্ষ, কত মাস, দিন,
যৌবন-জরায় হল লীন,
শুকালো মুখের ফলগুলি—
দীনার সকল নিবেদন।
এপথে বারেক পথ ভুলি
রামরূপে এস গো মরণ!

এস, লয়ে রাঙাপদ-ধূলি
আঁকো এ অশীতি-শুভ্র সিঁথি,
কানে-কানে ডাকো নাম ধরি
বলো—'আমি এসেছি, শবরী,
সন্ধ্যা হল তব তপোবনে,
এ-রজনী তোমারি অতিথি।'
এস ত্রস্ত ব্যাকুল চরণে
মর্মরিয়া শুষ্ক বনবীথি।

আজি মোর রিক্ত তপোবনে
শেষ ফল হতেছে নিষ্ফল,
কখন যে আসো, ভাবি তাই—
যে-আঁখি কখনো মুদি নাই
নিবে-আসা সে-আঁখির জলে
ফুটে ওঠো নব নীলোৎপল।
তুলে নাও রক্তকরতলে
আমার বনের শেষ ফল।

সমাপ্তি

মরমীয়া বন্ধুর মরুময় সন্ধান ;—
ছুটোছুটি কেটে গেল চৌপর দিনমান।
ঘনাইল ত্রিযামা যামিনী অমাবস্যা,
আকাশে অসংখ্য অসূর্যম্পশ্যা।
ঝিকিমিকি তারা-ভরা ডুব্-জলে নাবছি,
এ শেষ জলাঞ্জলি কে ধরবে ভাবছি।
গঙ্গে-যমুনে-গোদাবরী হে সরস্বতী
তোমাদেরি স্রোতে পূত করো এ স্রোতস্বতী,
সিন্ধু-কাবেরী ওঁ নর্মদা-তাপ্তী,
স্নাতকে দেহ গো আজি স্নিগ্ধ সমাপ্তি।

গন্ধধারা

ফুলের গন্ধ বাজে মোর বুকে,—
বন্ধু, তোমারে কয়েছি আগে ;
এখন গন্ধ মন্দ লাগে না,
ফুলের গন্ধ ভালোই লাগে।
এখন বোশেখে প্রতি ভোরবেলা
যতনে চয়িত মল্লিকা-বেলা
চাঁপা-চামেলির নানান ঝামেলা
কবির টেবিলে নিত্য,
ফুলদানি ডিসে কত ফিস্‌ফাস্‌,
চাপা অধরের কাঁপা উল্লাস,
গন্ধে ভরিয়া ঘরের বাতাস
ম' ম' করে মম চিত্তে।

দুধের পেয়ালা সদ্যস্ফুট,
হৈয়ঙ্গবীনমাখা বিস্কুট,
মক্ষিকা আসি জুড়ে করপুট,
রসনাসরস ঘ্রাণে ;
কুহুরবে দিক করে চম্‌চম্‌
শব্দে গন্ধে প্রাণ ছম্‌ছম্‌
এতদিনে হয় হৃদয়ঙ্গম
দেহধারণের মানে।
গোলাপে-কমলে ডাঁটায়-ডাঁটায়
যে ব্যথা শিহরে কাঁটায়-কাঁটায়,
সেই ব্যথা ফুটে পাপড়ির পুটে,
হয়ে ওঠে সৌরভ,
কোমল বুকের যা-কিছু বেদন,
গন্ধ যে তারি মূক নিবেদন,—
সারা যৌবন দিয়ে তা বন্ধু,

করেছিনু অনুভব।
ফুলের গন্ধ শূলের মতন
বিঁধিত যে মোর দিল্—
আজ বুঝিয়াছি সেটা শুধু, সুখে
থাকিতে ভূতের কিল।
যে-সুখ বেলি ও চামেলি-গন্ধে,
অবশ করিছে এ নাসারন্ধ্রে,
যে-সুখ কাঁপিছে এ মোর ছন্দে—
তা যদি মিথ্যা হয়,
যে দুঃখ তবে হৃদয়ে-হৃদয়ে
তুষানল-সম ধোঁয়াইয়া দহে,
যে-দুখ বীণার ছেঁড়া তার বহে,
কেন তা মিথ্যা নয়?
দুঁহু কোড়ে কেঁদে গেল যৌবন,
কাঁদে আজ জরা-জড়ানো জীবন,
কাঁদিয়া অন্ধ করিনু নয়ন,
কি ফল লভিনু তাহে?
যাবার বেলায় তাই ফুল আনি,
যতনে সাজাই ভাঙা ফুলদানি,
মহাতৃষাতুর এ-মহাপ্রাণী,
রসের পেয়ালা চাহে।

খোলা কথা

শুধালে তো কহি প্রিয়,
অপরাধ নাহি নিও,
যৌবন গেছে—গেছি বেঁচে।
তোমার প্রেমের ভার
দিবা-রাতি বহিবার
গুরু দায় আজ ফুরায়েছে।

এই দেহ এই মন
সাজায়েছি অনুখন
তোমার মনের মতো করি,
পাছে তুমি পাও ব্যথা,

কয়েছি সুখেরই কথা
গতনিদ্ কত বিভাবরী।

জাগর-ক্লান্তি ভুলি,
লইয়া পায়ের ধূলি
দিনের সেবায় দিছি মন।
কত কাঁটা পা'য় পা'য়
ঢেকেছি তা আলতায়,
গঞ্জনা করি আভরণ।

কহিনি মনের সাধ
ঘটে পাছে অপরাধ,
তুমি যে সদাই ক্ষুধাতুর ;
দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া
সাজিয়া প্রাণপ্রিয়া
সুধায় করেছ ক্ষুধা দূর!

শুকায়নি ভিজে চুল,
তবু তাহে গুঁজি ফুল
রচিয়াছি সাঁঝের কবরী।
না সারি হাতের কাজ
করেছি রাতের সাজ
তোমার রজনী দিতে ভরি।

বাড়াতে তোমারি মান
করিয়াছি অভিমান
দু-নয়নে ভরি জলে-ছলে ;
কভু সাজি অপরাধী
চরণে পড়েছি কাঁদি
তুমি তাই ভালোবাসো বলে।

ভুলিয়া স্বজনগণে
জপিয়াছি একমনে
এ-প্রাণ তোমারে শুধু চায় ;
উজাড় করিয়া তনু
কত ফুলই যোগায়নু
মালা গাঁথি পরাতে তোমায়!

জীবন করিয়া ক্ষয়
সযতনে সঞ্চয়
করেছি তোমারি যত দান।
সকল বেদনা ভুলে
হাসিয়া দিয়েছি তুলে
তব কোলে তব সন্তান।

বার-বার মা হবার
ব্যথা নহে বুঝাবার,
তাও হায় দিয়ে যায় ফাঁকি।
সহসা চোখের জলে
ধুয়ে যায় পলে-পলে
হৃদয়-শোণিতে যারে আঁকি ;

লালন-পালন ভার
সেও নহে বুঝাবার
কত সুখ কত জাগরণ!
এক বুকে ছেলে জেগে,
আর বুক বাপে মাগে,
যুবতীর এহি যৌবন!

যে প্রেম যে যৌবন
পুঁথি-পাতে সুলোভন
জীবনে তা কোথায় বা রহে?
যে দুঃস্বপ্ন ঘোর
বহিনু আকৈশোর
যৌবন তারেই তো কহে।

সেই যৌবন-তরে
পরম আকুতিভরে
তিলেক সহনি বিচ্ছেদ।
পড়িয়া ধাঁধায় তার,
হায় বিধি বিধাতার,
প্রেম বলে চলে নারীমেধ।

সে যৌবন মম
সেই প্রেম, প্রিয়তম,
চলে গেছে তুমি কাঁদো তাই।

আমি যে বেঁচেছি প্রিয়,
দু-পায়ের ধুলা দিও,
তারে আর ফিরিয়া না চাই।

যৌবন নিবাইয়া
যে বিধি জুড়ালে হিয়া,
সে-বিধি নারীর হিতকারী।
যদি পায়ে থাকে মতি,
যদি আমি হই সতী,
আর যেন নাহি হই নারী।

সুখভোগ

বহু সুখ ভালে লিখিলে বন্ধু,
লিখিলে না সুখভোগ,
সাথে বেঁধে দিলে শিব-অসাধ্য
বিদ্‌ঘুটে এক রোগ।
হোমিও-ঘুমিও-অ্যালো-জল-প্যাথি
আয়ুর্বেদের ঘটে অখ্যাতি,
কিছুতে কাটে না এ ভুতুড়ে ব্যাধি
যত ঝাড়ি ততো বাড়ে,
সর্ষের মাঝে আছে বসিয়া যে
সর্ষেরে সে কি ছাড়ে?

হয়তো পুণ্য ছিল কোনকালে—
সঘৃত অন্ন লিখিলে কপালে,
জুটে নিয়মিত সন্ধ্যা-সকালে
ধোঁয়ানো দুধের বাটি!
সে ঘৃতান্নের প্রতি গ্রাসে-গ্রাসে
যত নিরন্ন মুখ মনে আসে,
চুমুকে-চুমুকে দুধের ছেলের
ক্ষুধার কান্নাকাটি।

এ-মোর অন্নে কোন নিরন্ন
জানায়নি প্রতিবাদ।

রসনা-তোষণ ভোজনায়োজন
তবু লাগে বিস্বাদ।
কেহ কহে ইহা দুঃখবাদ গো
কেহ বা বায়ুব্যাধি।
দুখে দুখ পাই, সুখে সুখ নাই,
মুখে হাসি বুকে কাঁদি।
মধুমালতীর মঞ্চে আমার
এসেছে ফুলের বান,
দখিন হাওয়ায় দোল দিয়ে যায়
উঠে ঘন সুঘ্রাণ।

তন্বীরা যেন স্তনভারানতা—
ফুলভারে দুলে মালঞ্চলতা,
বসি তারি তলে সকালে-বিকালে
অবসর মোর কাটে।
ঈর্ষাকতার—পথিকেরা চলে
ধূলি-ধূসরিত বাটে।

তারা তো জানে না সে ফুলের বানে
ভেসে চলি আমি কোন্ সে শ্মশানে
ঝরা কুসুমের মরা মুখগুলি
সারি-সারি যেথা শুয়ে।
কত ফাগুনের স্খলিত পাতার
ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা ভুঁয়ে।

এ-সুখের হাটে দিন মোর কাটে
সুখপরখের দুখে,
যে-ব্যথা আমার নহে আপনার
সেই ব্যথা কাঁদে বুকে।

যে প্রেম, বন্ধু, সুন্দর লাগি
চিত্ত-গহনে হয়েছে বিবাগী
মাঝে-মাঝে ভাবি ছেড়ে-ছুড়ে সবই
ফিরি তারি সন্ধানে।
পিছনে তাতল সৈকতে বারি—
বিন্দু সমেরা টানে।
তোহে বিসরিয়া সখ মন তাহে
করিনি সমর্পণ,

তাই দোটানায় প্রাণ বাহিরায়,
কি কাজে লাগি এখন?

সুতমিতদারা খুশি নয় তারা
তুমিও তো খুশি নয়,
দুঁহু যবে বাম মম পরিণাম
দ্বিগুণ নিরাশা নিশ্চয়।

সুখের সাগরে মিলে না সাঁতারি
দুখ মিটাবার একফোঁটা বারি
অসহ তিয়াস ঘন বহে শ্বাস
দুটি বাহু বলহীন,—
ঝুটার পিছনে খাঁটির মাতাল
ছুটে বল কতদিন?

ও অশথ!

ও অশথ, বাত্‌লে দে পথ,—
কেমন করে এমন হয়
হু-হু-হু চৈতী বায়ে
জরাজর্জর গায়ে
সহসা কি পুলকে
দুলে উঠে কিশলয়!
তোর দলে-দলে কিশলয়!
কেমন করে এখন হয়?

ফাগুনের ভাঙা হাটে
সেদিনও পাইনি রে তোর
অগোনা গাঁঠে-গাঁঠে
বয়সের গাছ কি পাথর;
বয়সের সেই গহনে
চকিতে মন উদাসি
বাজাল কেমন ক্ষণে
কে কিশোর এমন বাঁশি?
তোর অঙ্গভরা জীর্ণজরা
শ্যামে-শ্যামে-শ্যামময়!

তোর পথে বসা পাতাখসা
জীবন হল মধুময়!
কেমন করে এমন হয়।

পথিকের পথের বুকে
হারানো ছায়া ফিরে।
পাখিরা কলসুখে
ফিরে ফের শাখানীড়ে।
ফিরে সেই ঝুরুঝুরু
চলে নাচ দিনে-রেতে
পুরানোর পাঁজর বাজে
নতুনের পাঁয়জোড়েতে।
মহাকাল হয়ে নাকাল
মানে আপন পরাজয়।
কেমন করে এমন হয়?
ও অশথ!

দরিদ্রনারায়ণ

দেখে এনু প্ল্যাটফরমে-ফরমে
গড়ায়-গড়ায় নারায়ণ!
ওপার হইতে তাড়ায়ন পেয়ে
এপারে আত্ম-ভাঁড়ায়ন।
আহা, যত নর হল নারায়ণ।

শঙ্খ-চক্র-গদা ও পদ্ম
রাখি কাস্টম-ক্ষেত্রে,
অশ্রুমোচন কমললোচন
চাহে হরীতকী-নেত্রে।
ছোলা-কলা হাতে সেবকবৃন্দ
ডাকিছে, তোরা কে খাবি আয়,
ঢেউ-এ ঢেউ-এ এসে গাঁদি লেগে ভেসে
নারায়ণ আজ খাবি খায়।

এবার সেবার সুবর্ণযোগ,
ধ্বনিত দিক্-দিগন্ত,
দ্রাবিড়-বেলুড়-মাড়োয়ার হতে
ছুটিয়ে পুণ্যবন্ত।
যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়,
পতিতোদ্ধার-পরায়ণ,—
বাংলায় আর নর মেলা ভার,
যা আছে সেরেফ্ নারায়ণ!
সে-বারের শোধ নিতে ক্ষ্যাপা হর
নারায়ণে তুলে নিয়েছে পিঠে,
ত্রিশূল উঁচিয়ে খুঁচিয়ে-কুচিয়ে—
ছড়াবে নব একান্ন পীঠে।

তীর্থে-তীর্থে পাঁজরা-কণ্ঠা
দাপ্না-টেংরি সকলি পাবে,
প্রাণের চিহ্ন কোথাও পাবেনা
কন্যাকুমারী আপঞ্জাবে।
হায়-হায়-হায় শুধাব কাহায়,—
পদ্মার জল ছিল না কি রে?
কোন্ মরীচিকা মিটাতে দিল না
মৃত্যুপিপাসা সে স্বাদু নীরে?

দেখা দাও

দেখা দাও দেখা দাও।
আলো নিবিবার আগে একবার
সুন্দর, মোরে দেখা দাও।
তুমি রয়ে গেলে দেখার অতীত।
সবকিছু তাই দেখি কুৎসিত,
দেখার এ-দোষ যাবে না যদি না
দেখা দাও।

অপরূপ রূপ আঁখির সমুখে
আপনি যদি না ফুটে
অপরের ডাকা নামে বারে-বারে
ডাকিতে কি মন উঠে?

এস-এস-এস হে মোর অনামী,
অন্তর্হিত অন্তর্যামী
নিভৃতে-গোপনে আমি-হতে-আমি
দেখা দাও।

ওগো সুন্দর—তোমারে খুঁজিয়া
দীর্ঘ জীবন কাটে,
মুখে-মুখে আর বুকে-বুকে এই
অসুন্দরের হাটে।
ভাঙা-ছেঁড়া-কুচো দিয়ে জোড়াতালি
রূপে-রূপে শুধু মিলে চোরাবালি,
কুসুম শুকায় চাঁদ ডুবে যায়,—
দেখা দাও।

গন্ধ ফুকারি কাঁদে ফুলদল—
'দেখি নাই, দেখি নাই'।
ছন্দ ভুলিয়া কাঁদে মরা নদী,—
'সে কি নাই, সে কি নাই'?
সারাজীবন যে কত কটু কহি,
কেমনে লুকায়ে আছ সবি সহি।
দুখ দিতে তোমা কত দুখ বহি,—
দেখা দাও।

কণ্ঠে তোমার—যে মালা দুলাই
হয় তা শুষ্ক-ম্লান,
যে-ধূপেই তোমা করি গো আরতি,
ভস্মে সে অবসান।
এ-জ্বালা আমার যায়না কিছুতে
তাই ছুটি মরীচিকার পিছুতে,
সারাজীবনের নয়নাশ্রুতে
চিরসুন্দর, দেখা দাও।

সময়বিৎ*

গান যদি তার না থামাতে পারে
সমে অর্থাৎ সময়ে

---

* অংশবিশেষ

বুঝিবে কবির মগজ ভর্তি
গব্যে ওরফে গোময়ে।

*

*　　*

পুঞ্জপত্রে সুনিবিড় শ্যাম নিকুঞ্জ সম্ভবা
গাছভরা রাঙা জবা।

*

*　　*

হৃদয় আমার ঘর ছেড়ে যেতে চায়,—
অজানা ঢেউ-এর ঘায়
নির্জন কূল ভেঙে-ভেঙে পড়ে
সে-অতল দরিয়ায়।

*

*　　*

আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্বোধ চোর যারা,
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে—
সেয়ানা স্বদেশী তারা।

যে-চুরিতে ভাই জেলখাটা নাই
না আগে না পশ্চাৎ ;
নিরীহ আমরা বাণীর সেবক
তাতেই পাকাই হাত।

কবি নহি

আমার কবিতা হয়তো পড়নি কেহ,
পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।
কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ
বাঙলায় বসে ভাবে না সাহারা-গোবি।
চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধ-গীতি,
কত হাসিমুখ কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া, সুখ-দুখ

সে-সবে আমার নেশা ধরিলেনা চোখে—
মন বসিল না প্রেমের অলকা-লোকে,
ভরিল না খালি বুক।

কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত
যে-ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত—
আমি, সে-ব্যথায় চির-ব্যথিত।

কে আমার বুকে চিরতৃষা-জর্জর
চাহে শুধু দূর সুন্দর মরীচিকা?
বৃথা ডাকে তারে বাপী-কূপ-সরোবর
অন্তরে জ্বলে অনির্বাপ্য শিখা।
সে-শিখা টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে,
তর্জনী তুলি জ্বলে তা বাসরঘরে,
কে তারে বুঝিবে বলো?
সূর্যের মতো নির্বাক আহ্বানে
শিশির-কণায় কহে সে যে কানে-কানে—
আমি জ্বলি তুমি জ্বলো।

কবি নহি আমি, কবি নহি তথাপ্রথিত
অনাসৃষ্টির ঘনমন্থনে মথিত
আমি, অনাদি ব্যথায় ব্যথিত।

জানি না সে-ব্যথা কবে হবে কোথা শেষ
শুধু জানি—আমি ধরেছি নিরুদ্দেশ
মৃত্যুর ছায়াপথ,
বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলেছে তিমির ললাট 'পরে
মানুষের দাসখত।

কবি নহি আমি, করিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত ;
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত।

জন্মদিন

মেঘের আড়ালে আষাঢ় দিবস চুপি-চুপি চলে যায়,
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায়?
আবাহন-হীন এ-আষাঢ়-দিন বারে-বারে গেছে চলি,
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কী চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করনি স্মরণ বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারাজীবনের মুখ।
আজিকার, কালো রবি-শশাঙ্কে হয়নি কলঙ্কিত,
কাল-সাগরের কৃষ্ণকমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত।
ঢল-ঢল তার নির্মম শোভা সনির্বন্ধে ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সজল গগন ঢাকে।
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হল গুঞ্জনহীন,
মর্মের কোষে তপন-তারকা—তারি মধুপানে লীন।
চির-কলঙ্কী ওরে কবি তোর কি সৌভাগ্য বল্—
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল।

পেরেছিস কিরে চিনতে?
মরণকমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।
চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্,
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল-নির্বাক।

টুকরো*

ভগ্ন বাতায়ন 'পরে
হৃতশ্রী মুকুর করে বসেছি হেলিয়া,
মগ্ন আলো সন্ধ্যাকাশে
একুশে ফাল্গুন আসে রজনী মেলিয়া।

* অংশ

আসছে জন্মে

রোয়াবাঁধে খোলা বারান্দায়
শীতের সূর্য গড়ায়ে যায়।

পড়ন্ত রোদে পথের প্রান্তে
অশথের পাতা কাঁপছে,
কি শীত-গ্রীষ্ম কেঁপেই আসছে তারা ;
বলি-বঙ্কুর অশথের গুঁড়ি
একঠায়ে খাড়া ভাবছে,
কি শীত-গ্রীষ্ম সে শুধু ভেবেই সারা
একশ বছুরে উদ্ভট যত ভাবনা।
পড়ন্ত রোদে পিঠ পেতে শুয়ে
দুধোলো গাভীটি জাওরায়,
তন্দ্রিত চোখে ঠাওরায়—
সারা গোজন্মে কোথায় কিসের ভাবনা?
চোয়ালে জাবর, গোয়ালে ফিরেই
কোঁয়ালে বাছুর ও জাবনা।
একই ঠায়ে খাড়া একশ বছর দাঁড়ায়ে
অচল অশথগুঁড়ি
আঁধারের তলে অন্ধের-প্রায়
শিকড়ে-শিকড়ে রস হাতড়ায়,
করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি।
একই ঠায়ে খাড়া চিরনিদ্‌হারা
ঊর্ধ্বে আকাশ ফুঁড়ি
পাতায়-পাতায় আলো আঁকড়ায়,
শাখায়-শাখায় পাখা ঝাপ্‌টায়,
ঝড়ে-ঝড়ে মোড়ামুড়ি।
চিরচঞ্চল পায়ে-শৃঙ্খল
অচল অশথগুঁড়ি!

সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাইটি ভালো,
নধর-চিকন-কালো ;
অচল নয় সে চরে খেতে পারে,
লেজের বাড়িতে ডাঁশ-মশা মারে,
ভুলেও ভাবে না দুষ্প্রাপ্যের ভাবনা :

অতীব সরল হিসাব তাহার
দুধের বদলে জাবনা।
উপরন্তু সে জাবর কাটে
পড়ন্ত রোদে ভরা পেট পেতে
ঢুলুঢুলু আঁখি শীতের মাঠে।
গলার দড়াটা মাঝে-মাঝে খোলা পায়,
তারি আনন্দে ঘন-রোমাঞ্চ-কায়।

এবারের মতো মনিষ্যি হয়ে
পুণ্যের ঘরে শূন্য ;
সব কথা যদি খুলে বলি তবে
শত্রু হাসিবে
বন্ধুরা হবে ক্ষুণ্ণ।
সুতরাং সব চেপেই যাই,
রোঢ়াবাঁধে এসে বন্ধুবরের খবর নাই।
সে যে ছিল মোর সর্বযামী,
দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসিতাম
আসছে জন্মে কী হব আমি?
জানায়ে দিতাম আমারও দাবি—
পথের প্রান্তে অশথগাছ, না
সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাভী?
আমার মতন মনিষ্যিদের
খোলা আছে দুটি ভবিষ্যৎ,
হয় গোজন্ম নয় অশথ!

কোজাগরী

রজনী গভীর হয়ে আসে,
ধ্রুবতারা জ্বলিছে আকাশে,
ধানক্ষেত কুয়াশায় হারা,
ঝিঁঝিভরা বেণুবনে চুপি-চুপি চলেছে ইসারা।
প্রহরী পিটায় লোহা-কাঠের কাঁসর।
প্যাগোডায় ঘণ্টার স্বর,
দূরে-দূরে কৃষকেরা মেতেছে ক্রীড়ায়,
আরও দূরে কুটিরে কে গায়?

রজনী গভীর হয়ে আসে।
কথা কয়ে যাই মৃদুভাষে,
পাশাপাশি বসে দুজনায়,
জীবন মধুর লাগে রজনীর-প্রায়।
পাহাড়ের গায়ে
উঠে আসে রাঙা চাঁদ গাছে-গাছে আগুন ধরায়ে।

ওই ধ্রুবতারা
জ্বলিতেছে ফানুসের-পারা।
লঘু বায়ুভরে
শিশিরের কণাগুলি মুখে এসে পড়ে,
আসে দূর মাদলের ধ্বনি,
দুজনে বসিয়া থাকি সারাটি রজনী।

[আনামের কবিতা]

কম্‌লা পাতার ছায়া

একলা কিশোরী ঘরে
তোলে ঘাগরার 'পরে
সারাবেলা রেশমের ফুল।
সহসা বাঁশির ধ্বনি,
শুনিয়া শিহরে ধনি,
কে যেন কিশোর তার চুমে শ্রুতিমূল।
কম্‌লার পাতাগুলি
বাতাসে উঠিছে দুলি
মোমজামি জানালার পিছে।
ছায়াগুলি জানু 'পরে
ছুটোছুটি খেলা করে
কে যেন ঘাগরাখানি টানিয়া ছিঁড়িছে।

[চীনদেশীয় কবিতা]

বিয়ের প্রস্তাব

তরমুজেরি বীজের মতো তোমার আঁখি কালো।
তরমুজেরি শাঁসের মতো ঠোঁট-দুখানি রাঙা,
সুডৌল তরমুজেরি মতো মোহন কটিদেশ,
তোমারে লাগে বেশ।
আমার প্রিয় অশ্বী হতে তুমি যে সুন্দর,
নিতম্বটি তাহারো চেয়ে নিটোল দৃঢ়তর,
হাল্‌কা তালে দুল্‌কি চালে চলন তারি-সম ;—
মহোৎসব কবির যদি এসো গো ঘরে মম।

এক-এক দলে একশ মেষ, একশ হেন দল
চরছে তারা তরাই ছেয়ে হিমালয়ের তল।
তা থেকে বেছে আনব দুটি সব্‌সে-সেরা মেষ—
রেশ্‌মি লোম, নধর দেহ, গাঁট্টা-গোটা বেশ ;
পাণ্ডুঠাকুরের দেউলে দুজনে যাব চলি
তোমার লাগি পুত্র মাগি একটি দেব বলি।
আরেকটির জবাই করে, গোলাপ-ডালে বিঁধে
গোটাকে-গোটা ঝল্‌সে নেব কাবাব করে সিধে।
ভোজের দিনে নিমন্ত্রিয়া করব আমি জড়ো

দেখতে যারা খুবসুরৎ, ভোজনে-পানে দড়।
চলবে যবে খানা ও পিনা সমানে তিন রোজ,
তোমারে ঘিরে আমার ঘরে চলবে যবে ভোজ।
পরাব হাতে রূপোর বালা, পায়েতে পাঁয়জোর,
গলায় দেবো সোনার মালা এস গো ঘরে মোর।

[Song of Kafiristan]

উইলো পাতা

জানালায় বসে স্বপন দেখে যে
ভালোবাসি সেই মেয়েটিরে।
শিল্প-বাহার সৌধ তাহার
আছে বটে পীত নদীতীরে,
শুধু সেই জন্যেই ভালোবাসিনে সে
মেয়েটিরে।
উইলো পাতাটি তারি হাত হতে,
খসে পড়েছিল নদীনীরে,
তাই ভালোবাসি সেই মেয়েটিরে।
বড় ভালোবাসি পুবে হাওয়া।
পুব পাহাড়ে ফুলে-ফুলে সাদা
পীচের সুরভি যায় পাওয়া।
শুধু সেই জন্যেই ভালোবাসিনে গো
পুবে হাওয়া।
উইলো পাতাটি সেই এনে দিল
চলছিল যবে তরী বাওয়া,
তাই বড় ভালোবাসি পুবে হাওয়া।
উইলো পাতাটি বাসি ভালো।

তারি মুখে শুনি নব-বসন্তে
কবে ফের ধরা হবে আলো,
শুধু সেই জন্যেই পাতাটিরে নাহি
বাসি ভালো,
ফুল তোলা সুচে মোর নাম তাহে
মেয়েটি যে উৎকীর্ণালো
তাই উইলো পাতাটি বাসি ভালো।

[চীনদেশীয় কবিতা]

মুঞ্জ তৃণ

আমরা ছিলাম দুই তীরে দুটি শ্যামল মুঞ্জ তৃণ,
ছোট্ট নদীটি মাঝখানে বহি চলে।
পরস্পরের পরশ তো মোরা পেতাম না কোনদিনও
উপাড়িয়া যদি না নিত স্রোতের জলে
না আসিলে শীত কে বল বাঁধিত আমাদের দুইজনে
জমাট হিমের তুহিন-ঘুমের নিবিড় আলিঙ্গনে?

[চীনদেশীয় কবিতা]

বসন্তে বাদল

কালকে বাদল ঝরেছিল সারারাত,
আজ ফিরে এল স্বচ্ছ সুপ্রভাত।
সিক্ত-শ্যামল তালীকুঞ্জের সার,
বুক মেলে দিয়ে ছায়া ফেলিতেছে তার।
ব্যথার বাদল ঝরে তবু মোরে ঘিরে,
স্মৃতিভারাতুর ঘরটিতে মোর আসি যাই ঘুরে-ফিরে।
আশপাশ হতে শ্যামল তরুর দল
শ্যাম ছায়া ফেলে জানালার পর্দায়,
শিশিরসিক্ত মখমলি শৈবাল
পরশে-পরশে পুলকাঞ্চিত কায়,
কমলা রঙের জালি ওড়নার তলে
আংরাখাটির আবছায়া রাঙা গোলাপের বুকে টলে।
দেখি আর মনে হয়,—
চারিদিকে মোর সকলই আবার মধুর জীবনময়।
ছাদে গিয়ে বসি
করিবার কিছু নাই,
শুধু গুনে গুনে যাই,
কত মাঠ,
কত পর্বত,
কত উপত্যকা,
কত নদী দিয়ে মোর বসন্ত পড়িল ঢাকা।

[চীনদেশীয় কবিতা]

সাদা-পাতা

মাথাটা রেখে হাতে
চেয়েই আছি খাতার সাদা পাতে,
তুলির মুখে শুকিয়ে ওঠে কালি
দেখছি তাই খালি।
ঘুমিয়ে গেল প্রাণ,—
জাগবে কিনা কে জানে সন্ধান?
ঝরতি রোদ্দুরে
খানিক আসি ঘুরে
ফুলের গায়ে বুলিয়ে হাত উঁচু শাখার চূড়ে।

ওই তো বন কোমল-ঘন শ্যামল শোভাময়ী,
ওই তো দূরে তুষার-ভাঙা
উজল রবিকিরণে রাঙা
নিপুণ-আঁকা শৈলরেখা কী সুন্দর ওই!

মেঘেরা দেখি চলেছে ধীরে ভেসে,
কাকেরা করে ব্যঙ্গ—শুনি কানে।
বসিয়া পড়ি আবর ঘুরে এসে
চাহিয়া থাকি সাদা পাতার পানে ;
তুলি যে তবু আঁচড় নাহি টানে।

[Chang-Chi (770-850)]

বাঁশ-বাগান

কুটির আমার ঘেরিয়া রয়েছে পুরানো বাঁশের বন,
ঘরের মেঝেয় ছড়ানো-ছিটানো কত পুঁথি পুরাতন।
মধুর তাহার ছায়ার বসিয়া আরাম লভিতে চাই,
সাধ হয় যত বড় কবিদের কবিতা পড়িয়া যাই।

অমনি আমার মনে পড়ে যায়,—
সেই যে জেলেচি, প্রতি সন্ধ্যায়
পাঁচতারা হাতে বেতের ডোঙায় গাহিয়া চলেছে গান,

জাল দেখে ফিরে নদীজলে-জলে,
ডোঙাখানি তার স্রোতে ভেসে চলে
আপন মনের খেয়াল খুশিতে গাহে সারা দিনমান।

পরিণয় ডোরে বাঁধিবে আমারে দিয়ে গেল তার কথা,
সেই যে জেলেটি, ফিরে তো এল না, না জানি রহিল কোথা?
ফেলিয়া গেল সে মাঝ-গাঙে মোরে,
ভাসিয়া বেড়াই কত?
গড়ায়ে-গড়ায়ে স্রোতের মুখের
বেতের ডোঙার মতো।

[আনামের কবিতা]

স্বচ্ছ নদীর বালিকা

স্বচ্ছ নদীটি ন-টি বাঁকে বেঁকে চলে,
স্বচ্ছ নদীটি, অগাধ জলের তলে
সবার নয়ন হইতে আপন সবুজ বালুরে ঢাকে।
স্বচ্ছ নদীর ভরি দুই তীর সারাবেলা পাখি ডাকে ;
ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিউ, ডিক্।

কে বালিকা তার পান্নার আঁখি মেলি
দাঁড়ায়েছে ওই মণ্ডপদ্বারে হেলি?
হৃদয়ে তাহার চাঁদের উদয় তন্ময় প্রেম-গানে,
যে প্রেমের গান নদীর উজান বহিয়া আসিছে কানে।

আঙিনায় পারে বাঁশের দুয়ার ধারে,
আপনি স্বপন বিভোর করেছে তারে।
বিলম্ব আর নহে ক্ষণকাল,
ছাড়িয়া চলিনু ছায়ার আড়াল,
কবিতার কথা প্রণয়-বারতা শুনাইব বালিকারে।

[আনামের কবিতা]

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা : দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। মাতা : মোহিতকুমারী দেবী। পিতামাতার একমাত্র জীবিত সন্তান। পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে।

শৈশব : জীবনের প্রথম বারো বছর কাটে হরিপুর গ্রামে। এই গ্রামের আমবাগান, অশ্বত্থগাছ, দিগন্তপ্রসারী মাঠ, বিল, পরপারের বিশাল চর, পল্লীপথ, পাখপাখালির ডাক, দোল, রথযাত্রা মহরম উৎসব-মুখরিত আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত বাল্যজীবন কবির মানসলোক গঠন করে। সেই সঙ্গে ছিল রামায়ণ-পাঁচালি, যাত্রা ও কথকতার প্রভাব। ছোটবয়সে খুবই ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন কবি; নিজের তির্যক কবি-স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে তাই তাঁর স্মৃতিকথায় মজা করে বলেছেন এই প্রসঙ্গ।

শিক্ষা : গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া; সেখানে ছাত্রবৃত্তি পাস করে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৯০৩); জেনাবেল অ্যাসেম্ব্লিস ইনস্টিটিউশন (এখন স্কটিশচার্চ কলেজ) থেকে এফ.এ (১৯০৫) এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯১১) হন।

বিবাহ : ১৯০৭ সালে হাজারিবাগের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী চারুচন্দ্র গুপ্তের মধ্যমা কন্যা জ্যোতির্লতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ। কবির তিন পুত্র, চার কন্যা।

কর্মজীবন : প্রথমে ইস্ট-ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে সার্ভেয়ার হিসেবে মাত্র ১২ দিন কাজ; ১৯১৩ সালে নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে ওভারসিয়ার এবং পরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত কাশিমবাজার রাজ-এস্টেটে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি প্রথমে কৃষ্ণনগর (১৯১৩-১৯২০), পরে বহরমপুর (১৯২৩-১৯২৯), কলকাতা (১৯২৯-১৯৪২) এবং পুনরায় কিছুকাল বহরমপুরে কাটান। কাশিমবাজার এস্টেটের কাজের সঙ্গে তিনি ১৯৩৭ থেকে প্রায় চার বছর নাটোর-এস্টেটের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

গ্রন্থ : মরীচিকা (১৯২৩); মরুশিখা (১৯২৭); মরুমায়া (১৯৩০); সায়ম্ (১৯৪১); ত্রিযামা (১৯৪৮); নিশান্তিকা (১৯৫৭)।

কাব্য-সংকলন : অনুপূর্বা (১৯৪৬; ২য় সংস্করণ ১৯৫৪)। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা-সংকলন (১৯৮১; ২য় মুদ্রণ ১৯৮৭; ৩য় মুদ্রণ ১৯৯০)।

কাব্যসংগ্রহ ১ম খণ্ড: (মরীচিকা, মরুশিখা ও মরুমায়া ১৯৮৭-৮৮)। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসংগ্রহ (প্রথম ভারবি সংস্করণ) ২০০০।

অনুবাদ : কুমারসম্ভব (সাল অনুল্লিখিত)। রথী ও সারথি (ভগবদ্ গীতার সহজ মর্মানুবাদ)। শেক্‌স্‌পীয়ারের ম্যাকবেথ (১৯৫২-৫৩)। ওথেলো (১৯৫৩-৫৪)। হ্যামলেট (১৯৫৩-৫৪)। এগুলি মাসিক বসুমতী ও শনিবারের চিঠিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। এ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা (অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত রচনা ১৯৫৩-৫৪)। গান্ধী বাণীকণিকা (১৯৪৮)। কোলরিজের 'রাইম অফ এন্সিয়েন্ট মেরিনার'-এর অনুবাদ : 'প্রাচীন নেয়ে' (১৯৪৮-এ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

কাব্যবিচার : কাব্য-পরিমিতি (১৯৩১); ২য় সংস্করণ (১৯৬৩)।

মৃত্যু : জীবনের শেষ পর্বে রোগজীর্ণ অসুস্থ শরীরে কবি দ্বিতীয় পুত্র অরুণকান্তি সেনের কাছে সিন্ধ্রিতে যান। পরে খড়্গপুর আই.আই.টি-র অধ্যাপক জ্যেষ্ঠপুত্র সুনীলকান্তি সেনের কাছে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর মৃত্যু।